শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রসঙ্গে

মনোরঞ্জন রায়

নিশান প্রকাশনী
৪৬, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

SHRAMIK ANDOLANEY AIKYA PRASANGEY

by

Monoranjan Roy

প্রকাশন কাল :

নভেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক :

সুবিমল দাস

প্রফুল্ল কানন

কলিকাতা-৫৯

প্রচ্ছদ :

গণেশ বসু

মুদ্রক :

জয়শ্রী প্রেস

শ্রীবিজয় কুমার ঘোষ

৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,

কলিকাতা-৬

ভূমিকা

মজুরী দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংগঠন ও ঐক্যই শ্রমিক-শ্রেণীর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কিন্তু সেই ঐক্য একদিনে গড়ে ওঠে না এবং তা গড়ে তোলা ও টিকিয়ে রাখাও অত্যন্ত কঠিন। দীর্ঘদিন ধরে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষকে বিভক্ত করে রাখার জন্য শাসক-শ্রেণীর বিভিন্ন কৌশলের মোকাবিলা করেই সেই ঐক্য গড়ে তুলতে হয়। অতীত ইতিহাস থেকেও আমরা এই শিক্ষাই পাই। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হয়েছিল তার ইতিহাস আজকের দিনের শ্রমিক সংগঠকদের অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই। কমরেড মনোরঞ্জন রায়ের গ্রন্থে সেই স্মরণীয় যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই সারা দেশে শ্রমিক আন্দোলনে যে জোয়ার এসেছিল, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে তাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারগুলো অবর্ণনীয় দমন-পীড়ন চালায়। সাথে সাথে শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন এ আই টি ইউ সি-কেও ভাঙ্গা হয়। গঠিত হয় আই এন টি ইউ সি। এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে কমিউনিস্ট পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের উপর কংগ্রেস সরকারের দমন পীড়ন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিন সেই কঠিন পরিস্থিতির মুখেও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা ও কর্মীরা যে অসীম ধৈর্য্যশীল ও ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য বহন করছে

ঐ সময়ের বিরাট বিরাট ও দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনগুলি। সেদিন শ্রমিক ঐক্যের যে বনিয়াদ রচিত হয়েছিল তাই পরবর্তী-যুগে আরো শক্তিশালী হয়ে গণ-আন্দোলনকে তীব্রতর করতে সাহায্য করেছিল।

আজ যখন শাসকশ্রেণী সারা দেশে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের শক্তিকে উৎসাহিত করে মেহনতী মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট, যখন সাম্রাজ্যবাদের মদতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে, তখন শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের ঐক্যের প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিক থেকে কমরেড মনোরঞ্জন রায়ের এই বইটি সময়োপযোগী হয়েছে।

আমি মনে করি বর্তমান ও আগামী দিনের শ্রমিক সংগঠকরা এই বইটি পড়ে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করতে পারবেন।

লেখকের কথা

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছে এক শতাব্দীর উপর। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সংগঠিত ও রাজনীতি সচেতন শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা ও প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এবং আজও তার অগ্রগতি অব্যাহত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরের বছর গুলিতে ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিশেষ করে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতের জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীকেও প্রচণ্ড ভাবে আলোড়িত করে। ১৯১৮ সাল থেকে ভারতে ধর্মঘট সংগ্রামের যে জোয়ার শুরু হয় তা ১৯১৯-২০ সালে প্রচণ্ড তীব্রতা ও ব্যাপ্তি লাভ করে। রজনী পাম দত্তর ভাষায় 'ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এক লাফে পূর্ণ সক্রিয় আন্দোলনে ঝাঁপ দেয়'। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। অবশ্য এর আগেও কিছু কিছু শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই ছিল স্থানীয়, আশু দাবী-ভিত্তিক, খণ্ড বিচ্ছিন্ন সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন শ্রমিক আন্দোলন-গুলো সর্বপ্রথম এক সবভারতীয় সাংগঠনিক রূপ পেলো।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে কাজ আরো অনেক কৃতী গবেষক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক করেছেন। কিন্তু সেই সব ইতিহাস গ্রন্থের বিষয়বস্তু স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের শ্রমিক আন্দোলন। আমার যতদূর জানা আছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম কয়েক বছরের শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে কোনও ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। অথচ এই সময়কালেই একদিকে যেমন শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন-সংগ্রাম তীব্রতর রূপ নিয়ে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকা পালন করতে থাকে, তেমনিই বিভিন্ন মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও একের পর এক বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে স্বাধীন ভারতে সদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুঁজিপতিশ্রেণী ও শাসক কংগ্রেস জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণ ও অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেয়। এই তীব্র শোষণ ও অত্যাচারের মুখে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার যে উপলব্ধী দানা বাঁধতে থাকে তারই প্রতিফলন ঘটে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ধারাবাহিক ঐক্য প্রচেষ্টার মধ্যে।

দীর্ঘদিন ধরে অবিভক্ত বঙ্গদেশ ও পরে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক

আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার সুবাদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এই রাজ্যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন-সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য প্রচেষ্টার কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার হয়েছে। আজ যখন শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনে নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে, তখন নিকট অতীতের এইসব মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়তো শ্রমিকশ্রেণীকে নতুন প্রেরণা ও দিক্‌নির্দেশ দিতে পারবে এই বিশ্বাস নিয়েই এই লেখা শুরু করি।

বইটির নাম 'শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রসঙ্গে' রাখা হলেও, এটি মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন-সংগ্রাম ও ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস। এতে ১৯৪৫-৪৬ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল, এই দশ বছরে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রয়াসের ইতিহাস যথাসম্ভব বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। লেখাটি প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির মাসিক মুখপত্র 'শ্রমিক আন্দোলন' পত্রিকায়। 'নিশান' প্রকাশক সংস্থার শ্রীসুবিমল দাসের আগ্রহে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত।

দীর্ঘ দিনের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

বছর দুই আগে যখন এই লেখার কাজ শুরু করি তখন থেকেই আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না—বয়সের নানা রোগে আক্রান্ত। এই দীর্ঘ সময় ধরে শ্রুতিলিখন নিয়ে যাঁরা অক্লান্তভাবে এই বইটি লেখার কাজে আমায় সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে হিরন্ময় হাজরা, দেবী সাহা ও গার্গী কুণ্ডুর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। এদের সাহায্য না পেলে হয়তো এই লেখা অসমাপ্ত থেকে যেতো। মহিলা সংগঠক তপতী ভট্টাচার্য বিভিন্ন সূত্র থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। 'শ্রমিক আন্দোলন' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রশান্ত ঘোষও আমাকে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনার কাজে সাহায্য করেছেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ ইতিহাস লেখার দুরূহ কাজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম তা সার্থক হলেই গ্রন্থের সার্থকতা। আশা করি বর্তমান ও আগামী দিনের শ্রমিক সংগঠক, গবেষক ও ছাত্র-যুব আন্দোলনের সংগঠকদের কাজে এই বইটি সহায়ক হবে।

মনোরঞ্জন রায়

পত্রসূচী

১

১৮৬৬ সালের ৩—৮ সেপ্টেম্বর জেনেভায় শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির যে প্রথম কংগ্রেস হয় তার কেন্দ্রীয় পরিষদ (পরে সাধারণ পরিষদ নামে অভিহিত)-এর প্রতিনিধিদের জন্য কার্ল মার্কস তাঁর নির্দেশে ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে লেখেন—"পুঁজি হল পুঞ্জীভূত সামাজিক শক্তি যে ক্ষেত্রে শ্রমিক শুধু শ্রম-শক্তির অধিকারী। সুতরাং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চুক্তি কখনোই হতে পারে না ন্যায্য ভিত্তিতে, এমনকি যে সমাজে জীবনধারণ ও শ্রমের বাস্তব উপায় জীবন্ত উৎপাদন-শক্তির বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ন্যায্য। শ্রমিকদের সামাজিক শক্তি নিহিত কেবল তাদের সংখ্যায়। কিন্তু সংখ্যায় শ্রেষ্ঠতার শক্তি ধ্বংস পায় তাদের ঐক্যহীনতায়। শ্রমিকদের ঐক্যহীনতা গড়ে ওঠে ও টিঁকে থাকে তাদের নিজেদের মধ্যেই অনিবার্য প্রতিযোগিতার ফলে।

"অন্তত সাধারণ দাসের অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেবে, চুক্তিতে এরূপ শর্ত আদায়ের জন্য এই প্রতিযোগিতা দূর করা অথবা নিদেন পক্ষে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস থেকে প্রথমে উদ্ভব হয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির।...অন্যদিকে নিজেদের অজ্ঞাতেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণীর সাংগঠনিক কেন্দ্র...।

"পুঁজির সঙ্গে একান্তরূপে স্থানীয় ও তাৎক্ষণিক সংগ্রামে বড়ো বেশি ঘন ঘন লিপ্ত থাকায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি খোদ মজুরি-দাসত্বের ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধেই সংগ্রামে কী শক্তি ধরে সে বিষয়ে এখনো তারা পুরো সচেতন হয়ে ওঠে নি। সেইজন্য সাধারণ

ঐক্যে পরিণত করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়াস চালানো এবং শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল করা। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো, শ্রমিকশ্রেণী যেখানেই বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করতে সমর্থ হয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে শ্রেণী-ঐক্য এবং ব্যাপক জনসাধারণের সাথেও শ্রমিক-শ্রেণীর নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একথা ঠিক যে, পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী তার স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেছে! কিন্তু একথা কোনক্রমেই বলা চলে না যে তখনও শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত ছিল।

পৃথিবীর সকল দেশের মতোই আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসও হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের বহিঃ-প্রকাশ দেখা গেছে কখনো প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, আবার কখনো সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনে। এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মুক্তি আন্দোলনের মঞ্চে দেশীয় বুর্জোয়াদের সাথে মিলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সামিল হয়েছে সেই সময়কাল থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর ওপর সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব বিদ্যমান। বোম্বের যে শ্রমিকশ্রেণী ১৯৪৫-৪৬ সালে নৌবিদ্রোহের দিনগুলিতে ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও লীগ-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে ইংরেজ সেনার সাথে প্রত্যক্ষ লড়াযে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল এবং দু'শর বেশী শ্রমিক ব্রিটিশ সৈন্যের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল, সেই বোম্বের শ্রমিকশ্রেণীও কিন্তু স্বাধীনতাত্তোরকালে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না; ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে তা লক্ষ্য করা গেছে। তদানীন্তন বাংলাদেশের

শ্রমিকশ্রেণী ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে উত্তাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সামিল হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই তদানীন্তন বি পি টি ইউ সি-র আহ্বানে ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল নিঃসন্দেহে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার পরিচায়ক। তথাপি একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীও সেদিন বুর্জোয়া মতাদর্শে প্রভাবান্বিত ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর এবং জনগণের ঐক্য সেদিন প্রতিষ্ঠিত হলেও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা ছিল দুর্বল। তাই আমরা দেখি, ঐ ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের মাত্র আঠারো দিন বাদে, ১৬ই আগস্ট, এক অভাবনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ২৯শে জুলাই শ্রমিক-শ্রেণীর আহ্বানে জনগণের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল এই দাঙ্গায় তাকে ধূলিসাৎ করে দিতে সমর্থ হয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নামধেয় ধনিকশ্রেণীর দলগুলি। পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি রাজ্যেও দাঙ্গার একই চিত্র দেখা গেছে। পাঞ্জাবে ধর্মভিত্তিতে লোক-বিনিময় হয়; তার ফলে, সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে দেশ বিভাগের পরও ভাঁটা পড়েনি; কারণ সে সময়েও রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলই ছিল শিল্পাঞ্চল এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায়ের মূল নেতৃত্ব পশ্চিমবংগেই থেকে যায়। ফলে, স্বল্পকালের মধ্যেই আবার উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিক সাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী বছরগুলিতে সারা দেশেই শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। ১৯৪৬ সালের ১১ই আগস্ট থেকে ডাক-তার বিভাগের শ্রমিক-কর্মচারীরা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে। এদের সমর্থনে প্রদেশে প্রদেশে শ্রমিকশ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের

নেতৃত্বে সংহতিমূলক আন্দোলনে সামিল হয়। সারা বোম্বাই প্রদেশে ২২শে জুলাই একদিনের ধর্মঘট পালিত হয়; ২৯শে জুলাই মাদ্রাজের শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট করে। ২৯শে জুলাই বাংলাদেশের সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ দিন মনুমেণ্ট ময়দানে বি পি টি ইউ সি-র তদানীন্তন সভাপতি মৃণাল কান্তি বসুর সভাপতিত্বে এক বিশাল কেন্দ্রীয় সমাবেশে বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিন, ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন আসামেও ২৯শে জুলাই সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়

ঐ বছর—১৯৪৬ সালে—সমগ্র দেশেই শ্রমিক ধর্মঘটের জোয়ার বয়ে যায়। সে বছরে ১৬২৯টি ধর্মঘট হয়। তাতে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৯,৬১,৯৪৮। করদ মিত্র রাজ্যগুলির ধর্মঘট এই হিসাবে ধরা হয় নি। এইসব ধর্মঘটের কয়েকটি হল-- এস আই রেলের ৪০ হাজার কর্মীর ধর্মঘট, কলকাতার ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট; ঢাকেশ্বরী মিল (নারায়ণগঞ্জ) এর ৭৫ দিনের ধর্মঘট, কলকাতার বিভিন্ন কারখানার ২৭,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট, এই প্রথম বোম্বের ২৫ হাজার ব্যাংককর্মীর ৮ই সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট বি ই এস টি, ই আই প্রেস-এর ধর্মঘট, আমেদাবাদ, গুজরাটে ১,৩০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট, মাদ্রাজের ১০,০০০ পৌর কর্মীর ধর্মঘট; ওড়িশার সংবাদপত্রগুলির ১ মাসের ধর্মঘট, কোলার স্বর্ণখনি, গিরিধির কয়লাখনির ধর্মঘট, উজ্জয়িনী, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, রতলামের সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট। উল্লেখের বিষয় হ'ল বহুস্থানে খেত-মজুররাও ধর্মঘট করে।

প্রদেশে প্রদেশে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারগুলি নিষ্ঠুর দমন-নীতি চালিয়ে শ্রমিক সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করার অপপ্রয়াস করে, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে সেদিনও এরা পিছ্‌পা হয় নি। তদানীন্তন করদ রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা

করা হয়। এর প্রতিবাদে ও গণতন্ত্রের দাবীতে সেখানকার ১ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমিককে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট করতে হয়।

অনেকগুলি কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকার আইন করে ধর্মঘটকে বে-আইনী করে; এর মধ্যে বোম্বে সরকার অন্যতম। বোম্বের সরকার অপর একটি আইন করে, যাতে সেইসব ইউনিয়নকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয় যারা বাধ্যতামূলক সালিশী মেনে নেয়। সেণ্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরারেও অনুরূপ আইন করা হয়। বোম্বে, সেণ্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরার, মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব সরকার পুলিশ আইনকে সংশোধন করে, অথবা নতুন আইন পাশ করে শ্রমিকদের ওপর যথেচ্ছ আক্রমণ করতে পুলিশের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেয়। বোম্বে সরকার খান্দেশের ৩টি ইউনিয়নের সকল কর্মকর্তাকে খান্দেশ থেকে বহিষ্কার করে। দিল্লী, সি পি ও বেরারে বহু শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ সময়ে মাদ্রাজে বর্তমানে সি আই টি ইউ-র অন্যতম প্রধান নেতা পি. রামমূর্তি এবং মাদ্রাজ প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পি. বালচন্দ্র মেনন সহ বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়। সাউথ ইস্টার্ন রেলের শ্রমিক ধর্মঘটের সময় ৫০ জন মহিলা সহ ১৫০০ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার বা আটক করেই শুধুমাত্র কংগ্রেস সরকারগুলি সন্তুষ্ট ছিল না, শ্রমিকশ্রেণীকে দমিত রাখার জন্য এরা অমানুষিক নিষ্পেষণ ও নির্বিচারে গুলি চালনা করে। সাউথ ইস্টার্ন রেলে গুলিতে নিহত হয় ৫ জন, আহত হয় শতাধিক; ১২ই জানুয়ারি গোয়ালিয়রে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে ৭ জনকে; ২৫শে মার্চ ঢাকার লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে ৮ জনকে নিহত, ১০০ জনকে আহত করা হয়; ১৬ই জুলাই রতলম করদ রাজ্যে ৩ জন নারী সহ ১০ জনকে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করে; আমালনের শহরে ধর্মঘটীদের উপর গুলি চালিয়ে ৯ জনকে

হত্যা করে, ৬৯ জনকে গুরুতর আহত করে ; কোয়েম্বাটুরে একটি মিলে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করে ১২ জনকে হত্যা করা হয় ; কোলার স্বর্ণখনিতে ধর্মঘটী ৪ জন শ্রমিক গুলিতে নিহত হয় ; কানপুরে সাধারণ ধর্মঘটের সময় ১ জন নারী সহ ৮ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়, আহত হয় ৫০ জন।

১৯৪৬ সালে বাংলা দেশে ঐতিহাসিক তেভাগা ও ময়মনসিংহ-র টংক আন্দোলনে বহু কৃষক তদানীন্তন লীগ সরকারের পুলিসের গুলিতে নিহত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, শ্রমিকশ্রেণী এই কৃষক আন্দোলনে সাহায্য করে এবং ৫ জন চাবাগান কর্মী, কৃষক আন্দোলনে নিহত হয়। এই সব ঘটনাই ঘটে ১৯৪৬ সালে।

প্রদেশে প্রদেশে শ্রমিকশ্রেণী কংগ্রেস সরকারগুলির আক্রমণের মুখেও তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যায়। যুদ্ধোত্তর কালে ব্যাপক ছাঁটাই, মুল্যবৃদ্ধি শ্রমিক সাধারণকে সংগ্রামে সামিল হতে বাধ্য করে। অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে সেদিন শেষ পর্যন্ত সারা ভারতে একটিই কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ছিল, তা হল এ আই টি ইউ সি।

কংগ্রেস নেতাদের শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস

এই সময় নিঃসন্দেহে দেশের শ্রমিক সংগ্রামের নেতা ছিল এ আই টি ইউ সি। এ আই টি ইউ সি দাবি তোলে : মূল বেতনের সাথে মহার্ঘভাতা জুড়ে দেওয়া, ন্যূনতম বেতন, ৮ ঘণ্টার কাজ, স্বাস্থ্যবীমা, বার্ধক্য পেন্সন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ও বেকারভাতা দিতে হবে। ঐ সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দেশব্যাপী শ্রমিক ঐক্য গঠনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৭ সালের ১৩-১৯ ফেব্রুয়ারি মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে কলকাতায় এ আই টি ইউ সি-র দ্বাবিংশতি অধিবেশন

অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়, তাতে এ আই টি ইউ সি-র রাজনৈতিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়—'এ আই টি ইউ সি ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য হল ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা।'

অপরদিকে ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতারা তথা বুর্জোয়া নেতারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও সংগঠনের প্রসারে সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা দেখেছে, নিষ্ঠুর দমন নীতি চালিয়ে, গুলি করেও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও ক্রমবর্ধমান সচেতনতাকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ-রফাকে নিরাপদ করা ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দেশের একমাত্র ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে ভাঙ্গা ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তায় শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই কংগ্রেস পরিচালিত হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সংঘ ১৯৪৭ সালের ৩-৪ মে দিল্লীতে এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীদের হাজির করা হয়—প্রায় সব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই প্রতিনিধি পাঠায়, এদের অধিকাংশই প্রাদেশিক কংগ্রেস লেবার সাবকমিটির সদস্য। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জে বি কৃপালনী, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, গুলজারিলাল নন্দা, খান্দুভাই দেশাই, হরিহর নাথ শাস্ত্রী, আর কে খাদিলকর, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ কংগ্রেসী নেতা এবং জহরলাল নেহেরু, জগজীবন রাম প্রমুখ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়া, অরুণা আসফ-আলী, অশোক মেহতার মতো সমাজতন্ত্রীরাও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংঘের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল,

উদ্বোধন করেন জে বি কৃপালনী। এ আই টি ইউ সি-র প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী সম্মেলনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ঐ প্রস্তাবে বলা হয়: "শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরোধী নেতৃত্বের পরিচালনায় দেশের শ্রমিক আন্দোলন যে পথে সম্প্রতি অগ্রসর হয়েছে তা সুস্থ এবং শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং দেশের জনগণের প্রকৃত স্বার্থের অপুরণীয় ক্ষতিসাধন করছে। যারা শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে, তাদের উপর আজ একটা পবিত্র এবং অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব এসেছে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যৌথ (?) প্রচেষ্টা গ্রহণ করার। তাই এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে।"

সভাপতির ভাষণে সর্দার প্যাটেল বলেন: "অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে সংশোধন করা ও তাকে দখল করার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ কমিউনিস্ট ইউনিয়নগুলি ভূয়া সদস্যসংখ্যা দেখায় এবং যে কোন বিবেকহীন পদ্ধতি গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে না·· আজ যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে এটা আগেই করা উচিত ছিল।"

সম্মেলনের ভাষণে গুলজারিলাল নন্দা বলেন—"আজকের সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে মূলগতভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী যে শ্রমিকরা ইতস্ততঃভাবে ছড়িয়ে আছেন তাদের সমন্বয়সাধন করার জন্য একটা সাংগঠনিক ব্যবস্থা করা।"

উপরোক্ত প্রস্তাব ও কংগ্রেসী নেতাদের ভাষণ থেকেই বোঝা গেল আই এন টি ইউ সি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট করা। এভাবেই দেশের শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদের বীজ বপন করা হল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ এবং প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতার উগ্রতা ধনিকশ্রেণীর মতাদর্শের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। কাজেই এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে অবশ্যই বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আই এন টি ইউ সি-র জন্মের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভেদ নীতির কাছে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের নীতির সাময়িক পরাজয় সূচিত হয়।

কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করলেও, সাম্প্রদায়িক দাংগায় ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য চিড় ধরলেও ৪৭ সালেই তদানীন্তন বঙ্গদেশে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংগ্রাম সুরু হয়। কলকাতা পোর্টের ৪৫ হাজার শ্রমিকের লাগাতার ধর্মঘটে উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে; ইংরেজ মালিকের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান ট্রাম শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে এই সময়েই।

এভাবেই ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দল দেশের শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে স্থায়ীভাবে এক বিরাট ও গভীর বিভেদ সৃষ্টি করে। অবশ্য এর আগেও, ১৯২৯ ও ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এ আই টি ইউ সি-তে বিভেদ ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সেই বিভেদ ও অনৈক্য কয়েক বছরের মধ্যেই দূরীভূত হয়েছিল এবং আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এ আই টি ইউ সি-তে মতাদর্শগত সংগ্রাম ও ভাঙন

১৯২৯ সালে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের ঢেউ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও এসে পড়ে। এন এম যোশী, ভি ভি গিরি, ভি আর কালাপ্পা, দেওয়ান চমনলাল প্রমুখ নেতারা এ আই টি ইউ সি-র সংগ্রাম-মুখী নীতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারছিলেন না; এঁরা নাগপুর সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যান এবং 'ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন

ফেডারেশন' নামক একটা নতুন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, জন্মকাল থেকেই এ আই টি ইউ সি-র অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও সংস্কারবাদীদের সাথে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত সংগ্রাম চলে এসেছে। এই মতাদর্শগত সংগ্রাম-এরই সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল এ আই টি ইউ সি-র দশম সম্মেলনে নাগপুরে। বিরোধের বিষয়গুলি ছিল: (১) বোম্বের গিরনি কামগর ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ৫০ হাজার হওয়া সত্ত্বেও তাকে কমিয়ে মাত্র ৬ হাজার করার জন্য সংস্কারপন্থী নেতাদের জেদ। (২) সাধারণ সম্পাদক কমিউনিস্ট নেতা এস ভি দেশপাণ্ডে উত্থাপিত প্রস্তাব। প্রস্তাবে তিনি 'মতিলাল নেহেরু রিপোর্ট'কে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চিরস্থায়ী করে রাখার দলিল বলে আখ্যা দেন। সাথে সাথে তিনি ভাইসরয় (বড়লাট) কর্তৃক গোলটেবিল সম্মেলন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সম্মেলন বর্জন করার দাবি জানিয়ে বলেন, ভারতের লক্ষ্য হ'ল সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, 'রয়েল কমিশন অন লেবার' কেও সম্পূর্ণ বয়কট করা হোক। বয়কটের যুক্তি হিসাবে বলা হয়: কমিশনটি সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিয়োজিত, যে সাম্রাজ্যবাদ ঠিক একই সময়ে দেশের শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রচণ্ড দমন পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। (৩) এ আই টি ইউ সি-কে 'প্যান প্যাসিফিক' সেক্রেটারিয়েটের সাথে যুক্ত করা; 'লীগ এগেনস্ট ইম্পেরিয়ালিজম'-এ যোগ দেওয়া এবং ইন্টার ন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনে (আই. এল. ও) প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকার জে এইচ হুইটলির সভাপতিত্বে 'রয়েল কমিশন অন লেবার ইন ইণ্ডিয়া' (যা হুইটলী কমিশন নামে পরিচিত) গঠন করে। এই

কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "ব্রিটিশ ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাগিচাগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, দক্ষতা, জীবনধারণের মান এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, রিপোর্ট প্রস্তুত এবং সুপারিশ করা"। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে এন এম যোশী ও দেওয়ান চমনলালকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তখন দেশের শ্রমিকশ্রেণী নিষ্পেষিত হচ্ছিল এবং শ্রমিক অসন্তোষ বেড়ে চলেছিল। ঐ কমিশন গঠনের আগের বছরে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে ধর্মঘট ও লক-আউটজনিত শ্রম বিরোধের সংখ্যা ছিল ২০৩টি; এই সব শ্রম বিরোধে জড়িত ছিল ৫,০৬,৮৫১ জন শ্রমিক; বিনষ্ট কাজের ঘণ্টা ছিল ৩,১৬,৪৭,৪০৪—১৯২১ থেকে '৪৫ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভুললে চলবে না যে, হুইটলী কমিশন গঠনের বছরেরই গোড়ার দিকে মার্চ মাসে দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আটক করা হয়। মুজফ্ফর আহমদ, আর এস নিম্বকর, এস ভি ঘাটে, কে এন যোগলেকার, ডি আর ঠেংরি, এস এ ডাঙ্গে, কিশোরীলাল ঘোষ, এস এইচ ঝাবওয়ালা, এস এস মীরাজকর, রাধারমণ মিত্র, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, সামসুল হুদা, শিবনাথ ব্যানার্জী, অর্জুন আত্মারাম আলভে, পি সি যোশী, গোবিন্দ রামচন্দ্র কাসলে, ফিলিপ স্প্রাট, বেন ব্রাডলি, লেস্টার হাচিনসন প্রমুখ আটক নেতাদের মধ্যে ছিলেন এ আই টি ইউ সি-র প্রাক্তন সভাপতি, সহ-সভাপতি, সহযোগী সম্পাদক, বোম্বে ও বাংলার প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদকদ্বয়, গিরনি কামগর ইউনিয়নের সমস্ত কর্মকর্তা, জি আই পি রেল-ওয়েমেন্স ইউনিয়নের অধিকাংশ কর্মকর্তা, এবং ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিনিধিরা। এ ছাড়াও কৃষক ও যুব আন্দোলন, প্রগতিশীল সংবাদপত্র ইত্যাদির সাথে যুক্ত আর যে সব নেতাদের

গ্রেপ্তার করা হয় তাঁরা হলেন শৌকত উসমানি, গোপাল বসাক, জি অধিকারী, এম এ মজিদ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, কেদারনাথ সেহগাল, গৌরীশংকর, সোহন সিং যোশ, এম জি দেশাই, অযোধ্যা প্রসাদ প্রমুখ।*

এ কথা হয়তো ঠিক যে ঐ নাগপুর সম্মেলনে এন এম যোশী প্রমুখকে 'সাম্রাজ্যবাদের চর' আখ্যা দেওয়া ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের পরিপন্থী ছিল। তবে একথাও সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার এন এম যোশীকে ১৯৩০, ৩১ ও ৩২ সালের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং ১৯৩১ সালে পুনরায় তাঁকে ভারতের আইন সভার সদস্য মনোনীত করে। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেকে উপলব্ধি করেন যে, ২৯ সালে এ আই টি ইউ সি র এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে শ্রমিক সংগঠনের ঐক্যকে যেভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া হয়েছিল তা সঠিক হয় নি। তাছাড়া, এ কথাও

---

* মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যে সকল নেতাদের গ্রেপ্তার করে আটক করা হয় তাঁদের পরিচিতি ছিল নিম্নরূপ: (১) এস. এ. ডাঙ্গে—সহকারী সম্পাদক, এ আই টি ইউ সি এবং সাধারণ সম্পাদক, গিরনি কামগর ইউনিয়ন। (২) কিশোরীলাল ঘোষ—সম্পাদক, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, এ আই টি ইউ সি। (৩) ডি. আর. ঠেংরি—প্রাক্তন সভাপতি ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্য, এ আই টি ইউ সি। (৪) এস. ভি. ঘাটে—প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, এ আই টি ইউ সি এবং সহ-সভাপতি, বোম্বে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। (৫) কে. এন. যোগলেকার—সংগঠন সম্পাদক, জি. আই. পি. রেলওয়েমেন্স ইউনিয়ন। (৬) এস. এইচ. ঝাবওয়ালা—সংগঠন সম্পাদক, এ আই আর এফ এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি, গিরনি কামগর ইউনিয়ন। (৭) মুজফ্‌ফর আহমদ—সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি, এ আই টি ইউ সি। (৮) এস. এস. মীরাজকর—সহ-সম্পাদক, গিরনি কামগর ইউনিয়ন, বোম্বে। (৯) অর্জুন আত্মারাম আলভে—সভাপতি, গিরনি কামগর ইউনিয়ন, বোম্বে। (১০) গোবিন্দ রামচন্দ্র কাসলে—গিরনি কামগর ইউনিয়নের কর্মকর্তা। (১১) আর. এস. নিম্বকর—সম্পাদক, বোম্বে

বিবেচনার যে, মাত্র ৯ বছর আগে গঠিত এ আই টি ইউ সি থেকে সকল সংস্কারপন্থীদের হটিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র বামপন্থীদের নেতৃত্বে দেশের সমগ্র শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার দৃষ্টিভংগী সঠিক ছিল কিনা।

১৯২৯ সালে সংস্কারপন্থী নেতারা বেরিয়ে গিয়ে আলাদা সংগঠন গড়ে তোলার পর ১৯৩২ সালে আবার অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলকাতা সম্মেলনে বোম্বের গিরনি কামগর ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব কারা করবেন—কান্দলকর-এর নেতৃত্বাধীন গ্রুপ, না এস ভি দেশপাণ্ডের গ্রুপ—সে প্রশ্নে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত এস, ভি, দেশপাণ্ডে, বি টি রণদিভে, জালালুদ্দিন বুখারি, সোমনাথ লাহিড়ী, এম এল জযভন্ত, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা আলাদাভাবে কার্যকরী সমিতির সভা করেন এবং মেটিয়াবুরুজে মাত্র বারোটি ইউনিয়নের এক প্রকাশ্য সম্মেলন করেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে এ আই টি ইউ সি-র ঐ কলকাতার সম্মেলনে সভাপতির বিরুদ্ধে বি টি রণদিভে উত্থাপিত নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব ২৬-২৪ ভোটে পরাজিত হয়। এর পর

ট্রেডস কাউন্সিল। (১২) রাধারমণ মিত্র—সম্পাদক, বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। (১৩) ধরণী গোস্বামী—বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কর্মকর্তা। (১৪) সামসুল হুদা—সম্পাদক, বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। (১৫) শিবনাথ ব্যানার্জী—সভাপতি, বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। (১৬) গোপেন চক্রবর্তী—ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইউনিয়নের কর্মকর্তা। (১৭) এল. আর. কদম—সংগঠক, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ঝাঁসি। (১৮) বি. এফ. ব্রাডলি—সদস্য, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, এ আই টি ইউ সি, জি আই পি রেলওয়েমেন্স ইউনিয়ন এবং গিরনি কামগর ইউনিয়ন; সহ-সভাপতি, এ আই আর সি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঐ মামলায় আটক ১৯ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে সকলেই এ আই টি ইউ সি-র সাথে যুক্ত ছিলেন।

কমিউনিস্ট কর্মীরা মেটিয়াবুরুজে গিয়ে আলাদা সম্মেলন করেন। এর পরই এঁরা রেড ইণ্টারন্যাশনালের ভারতীয় শাখা গঠন করে আর একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত করবার চেষ্টা করতে থাকেন।

পরের বছরে, ১৯৩২ সালে কমিউনিস্টরা মস্কোর 'রেড ইণ্টারন্যাশনাল অব লেবার'-এর অনুকরণে 'রেড টি ইউ সি' নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সময়ের অবস্থাটা খুব প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন রজনী পাম দত্ত তাঁর 'আজিকার ভারত' পুস্তকে। তিনি লিখেছেন: 'বামপন্থী নেতৃত্ব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত বলিয়াই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্তৃত্ব হাতে পাইয়াও তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভূমিকা থাকিবে কিনা প্রধানত: এই প্রশ্ন লইয়াই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আরও একটি ভাঙ্গন দেখা দেয়। শ্রমিকের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভূমিকাব সমর্থক কমিউনিস্টরা লালঝাণ্ডা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিলেন।

'এইসব ভাঙ্গনের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভয়ানক দুর্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু মজুর শ্রেণী পৃথক পৃথক ধর্মঘটের মধ্য দিয়া লড়াই চালাইতে লাগিল। শ্রমিকরা কেবল অর্থনৈতিক দাবি লইয়াই সংগ্রাম চালাইলেন না, লোক ছাঁটাই ও শাস্তিদানের বিরুদ্ধেও, অর্থাৎ সংঘ সমিতি গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার আদাযের জন্যও, তাঁহারা লড়াই করিতে লাগিলেন। ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৯, ১৯৩ ও ১৯৩১ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪১, ১৮৮ ও ১৬৬টি। এইসব ধর্মঘটে বৎসরে গড়ে লক্ষাধিক মজুর সংশ্লিষ্ট ছিলেন।'

তিনি আরও লিখেছেন, '১৯৩৩ সালে ১৪৬টি ধর্মঘটে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৩৮ জন মজুর যোগ দেন এবং মোট ২১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৬১টি কাজের ঘণ্টা নষ্ট হয়। ১৯৩৪ সালের ১৫৯টি

ধর্মঘটে সংশ্লিষ্ট ধর্মঘটীর সংখ্যা ও বিনষ্ট কাজের মোট পরিমাণ, দাঁড়ায় যথাক্রমে ২ লক্ষ ২০ হাজার ৮০৮ জন ও ৪৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৫৯ ঘণ্টা ; অর্থাৎ ইহার পূর্ববর্তী বৎসরের মোট ধর্মঘট ও মোট বিনষ্ট কাজের ঘণ্টার দ্বিগুণেরও অধিক।' তিনি আরও লিখেছেন—'এই বিপুল ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য হইতেই শ্রমিক সংগঠনগুলির পুনর্মিলনের চেষ্টা আরম্ভ হইল। ১৯৩৫ সালে লাল-ঝাণ্ডা ট্রেড ইউনিয়ন ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আবার এক হইয়া গেল।'

অর্থাৎ, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তিন ভাগে বিভক্ত হলেও এরই মাঝে ঐক্যের প্রয়াসও দেখা গেছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, এই সময়ে দেশে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠ্‌ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির বিভেদের কারণে এই সব ইউনিয়ন কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হতে চাইছিল না। এই পটভূমিতেই ১৯৩৬ সালে এ আই টি ইউ সি-র পঞ্চদশ সম্মেলনে—বোম্বেতে, ন্যাশনাল ফেডারেশনের নেতৃত্বের কাছে ঐক্যের আবেদন জানানো হয়। ১৯৩৮ সালের ১৭ই এপ্রিল নাগপুরে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এ আই টি ইউ সি এবং ন্যাশনাল ফেডারেশনের যুক্ত অধিবেশনে পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সারা দেশে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন রূপে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করে।

অবশ্য ১৯৪০ সালেও একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে যায় ; তা হ'ল এম এন রায়ের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)-কে সমর্থন করেন এবং বেরিয়ে গিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করেন। কিন্তু ঐ ফেডারেশনের জনসমর্থন ও প্রভাব খুবই নগণ্য ছিল।

এ আই টি ইউ সি-র অভ্যন্তরীণ ভাঙন ও দ্বন্দ্বগুলি তথা ভারতের

শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যের প্রশ্নকে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের দ্বারা ভাঙনের সাথে ১৯২৯, '৩১ ও '৩২ সালের ভাঙনের মূলগত পার্থক্য ছিল। স্বাধীনতার আগেই প্রদেশে প্রদেশে এবং নেহেরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রেও অন্তবর্তী সরকারে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব ছিল ; তারা শ্রমিক-শ্রেণীর জঙ্গী মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করার জন্যই তারা নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলে।

এটা স্মরণ রাখা দরকার, বর্তমানে রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন যে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে কাজ করছে তার সূচনা হয়েছিল ১৯২৯ সালে এ আই টি ইউ সি-র ভাঙনের পর। সেই থেকে রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির যে একটি মাত্র সংগঠন ছিল, সেটা হ'ল অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন (এ আই আর এফ)। এই সংগঠন অবশ্য কেন্দ্রীয় সংগঠন এ আই টি ইউ সি-র সংগে আর যুক্ত হয় নাই বা এর সংগে যুক্ত ইউনিয়নগুলিও এ আই টি ইউ সি-র সংগে যুক্ত হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালে আই এন টি ইউ সি গঠিত হবার পরবর্তীকালে এ আই আর এফ-এর ভিতরেও কংগ্রেস নেতারা ভাঙন ধরায় এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন রেলের শ্রমিকদের আলাদা আলাদা ইউনিয়ন গঠিত করে তাদের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন (এন আই আর এফ) গঠন করে রেলওয়ে শ্রমিক-দের মধ্যেও স্থায়ীভাবে ভাঙন ধরায়।

পরবর্তীকালে রেলের শ্রমিকদের মধ্যে আরো ভাঙন দেখা দেয়। বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত (বিভিন্ন ক্যাটাগরির) রেল শ্রমিকরা তাদের নিজ নিজ সংগঠন গড়ে তোলে, এ ভাবে বর্তমানে শুধু এ আই আর এফ ও এন আই আর এফ-ই নয়—বিভিন্ন ক্যাটাগরির শ্রমিক কর্মচারীদেরও আলাদা আলাদা ইউনিয়ন আছে। এই সব

ক্যাটাগরি ভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলি আবার এ আই আর এফ বা এন আই আর এফ কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। এন আই আর এফও সরাসরি কংগ্রেস পরিচালিত সংগঠন যেটা আবার আই এন টি ইউ সি-র সংগে যুক্ত, কিন্তু এ আই আর এফ যদিও স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে কাজ চালায় কিন্তু এর নেতৃত্ব আজও সংস্কারবাদীদের হাতেই আছে।

১৯৪৭ সালে এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে ভাঙন তথা শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের উপর সরাসরি হামলা করার প্রকৃত কারণগুলি আমরা আলোচনা করেছি। ১৯৪৬ সালে সারা দেশে প্রায় প্রতিটি শিল্প শ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ একটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। পূর্বে উল্লিখিত '৪৬ সালে ধর্মঘটকারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং তৎজনিত শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যার থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

সারা দেশে সমস্ত শিল্পে ধর্মঘটের জোয়ার এবং ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল যুদ্ধোত্তর-কালে একদিকে বেকারি, আর একদিকে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। বিলেতের একটি কাগজের মতে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের শিল্প শ্রমিক, বিভিন্ন আনুসঙ্গিক কাজে লিপ্ত শ্রমিক কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী এবং সৈন্য বাহিনীর সদস্যসহ মোট ৫০ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছিল (সুকোমল সেনের ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ২য় ভাগ)। সেই একই ভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। ঐ আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল যে প্রতিটি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এবং তার ফলে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বামপন্থী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এরই পাশাপাশি আবার অন্যদিকে কংগ্রেস মরিয়া হয়ে এই শ্রমিক আন্দোলনের ওপর আঘাত হানল।

স্বাধীনতার পর আবার ভাঙন

ভারত স্বাধীনতা লাভ করল; শ্রমিকশ্রেণীও সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে উৎসব আনন্দ করল। শ্রমিকশ্রেণী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করল ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যে দেশ বিভাগ হোল তার সামগ্রিক ফল এসে পড়ল শ্রমিকদের ঐক্যের উপর। দ্বিতীয়তঃ এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের প্রভাবান্বিত শ্রমিকদের নিয়ে এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে আলাদা সংগঠন (আই এন টি ইউ সি) গড়ে তোলার ফল হোল সুদূর প্রসারি। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেসই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ভিত্তিতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলল। অথচ এই কংগ্রেসই গান্ধীজীর নেতৃত্বে বহু পূর্বেই আমেদাবাদে সুতোকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার নামে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে আলাদাভাবে মজদুর মহাজন নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিল। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বারা গঠিত আই এন টি ইউ সি-র জন্ম হওয়ার পর এ আই টি ইউ সি-র মধ্যে আরো দ্রুত গতিতে ভাঙন দেখা দিল। ১৯৪৮ সালে ২২শে মার্চ নাসিকে, এ আই টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত সোশ্যালিস্ট নেতারা এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর একটি নূতন সংগঠন গঠন করেন; তার নামকরণ করা হয় ইণ্ডিয়ান লেবার কংগ্রেস। ঐ সময়েই আরো দুটি ছোট ছোট ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল —একটি হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত; আর একটি ছিল এম. এন. রায় পরিচালিত ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার। নবগঠিত ইণ্ডিয়ান লেবার কংগ্রেসের নেতারা সিদ্ধান্ত নেন যে ঐ তিনটি সংগঠনকে এক করে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন করতে হবে। ১৯৪৮ সালে ২৪শে

ডিসেম্বর ঐ তিনটি সংগঠনের নেতারা মিলিত হন এবং একটি নতুন সংগঠনের জন্ম হয়, ঐ সংগঠনের নাম দেওয়া হয় হিন্দ মজদুর সভা (এইচ্ এম এস)। এই সংগঠনটি প্রকৃতপক্ষে সোশ্যালিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হোত। এই সংগঠনটি সাম্রাজ্য-বাদী অর্থে পুষ্ট আই সি এফ টি ইউ-র সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ তার মানেই এরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৮ সালে ২৭শে ডিসেম্বর এ আই টি ইউ সি-র ভেতর থেকে আর একটি বামপন্থী দল বেরিয়ে গিয়ে ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নাম দিয়ে আর একটি সংগঠন গঠন করেন।

কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হবার পর আই এন টি ইউ সি-র ভূমিকা

১৯৪৮ সালে ২৫শে মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে কংগ্রেস সরকার বেআইনি ঘোষণা করে। রাজ্যের সমস্ত পার্টি অফিসে পুলিশ তালা বন্ধ করে দেয়। এর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলোকেও তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সংগে মাদ্রাজ প্রদেশে পার্টি শাখাকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে সরকারিভাবে বেআইনি ঘোষণা না করলেও পার্টির কাজকর্ম প্রকাশ্যে করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে। প্রচণ্ড দমন নীতির মুখে দাঁড়িয়ে সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৪৮, '৪৯, '৫০ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে কমিউনিস্টদের গোপনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করতে হোত। কমিউনিস্ট কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তারের ফলে অনেক শিল্প এলাকাতেই নেতৃত্বের যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয় তার পূর্ণ সুযোগ নেয় কংগ্রেস সরকার এবং সমস্ত কল-কারখানার খনি-বাগিচার মালিকরা। ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সংগঠন এ আই টি ইউ সি-র ভাঙনের মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়া শুরু

হয়েছিলো, ১৯৪৮, '৪৯, '৫০ সালের মধ্যে প্রায় সমস্ত শিল্পে এবং তাদের বিভিন্ন কারখানা, বাগিচা ও খনিতে এই ভাঙনকে প্রসারিত করা হোল। অর্থাৎ প্রতিটি শিল্পে ও ইউনিটে ইউনিটে আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়ন গড়ে উঠতে লাগল আগাছার মতো। কলে-কারখানার ইউনিটগুলোতে এ আই টি ইউ সি-র অনুপস্থিতিতে মালিকরা আই এন টি ইউ সি নেতাদের নিয়ে আই এন টি ইউ সি-র শাখা গঠন করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করল। কংগ্রেস সরকার আশা করেছিলেন যে সমস্ত মালিকদের সাহায্যে ভারতের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মতাদর্শের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বিস্তার করতে পারবে—বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারবে। এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য তারা প্রচার করতো যে কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা এনেছে এবং কংগ্রেস, সরকারে থাকায় একমাত্র তারাই শ্রমিকদের কিছু পাইয়ে দিতে পারবে। মালিকদের সাহায্যে এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে (সেই সময় ভারতের প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট নেতা এবং কর্মীরা হয় জেলে ছিলেন নয় আত্মগোপন করেছিলেন) কংগ্রেস আই এন টি ইউ সি-র শাখা রাজ্যে রাজ্যে এবং শিল্পে শিল্পে গঠন করতে পেরেছিলো ঠিকই, বিশেষ করে পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের মধ্যে, যাদের উপর আগে থেকেই বুর্জোয়া প্রভাব ছিল তাদের খুব দ্রুত আই এন টি ইউ সি-র মধ্যে সংগঠিত করতে পেরেছিলো। কমিউনিস্ট কর্মীদের অনুপস্থিতির সুযোগে এইচ এম এসও প্রদেশে প্রদেশে সুবিধা গ্রহণ করার চেষ্টা করল এবং অনেক জায়গায় তাদের শাখা গড়ে তুলতে সমর্থ হল। এইচ এম এস-এর মধ্যে আবার নেতৃত্বে যেমন সোশ্যালিস্টরা ছিলো সেরকম কংগ্রেস সভ্যও ছিলো। সেইদিক থেকে এই সংগঠন ছিল পাঁচ মিশালী সংগঠন। এদের সংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবই ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশী। পূর্বেই

উল্লেখ করেছি এই সংগঠনটি সাম্রাজ্যবাদী অর্থের দ্বারা পুষ্ট আন্ত-র্জাতিক সংগঠন আই সি এফ টি ইউ-র সংগে যুক্ত ছিলো, ফলে এদের নেতৃত্বের উপর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রভাব ছিলনা এটা বলা চলেনা।

এ আই টি ইউ সি থেকে যে বামপন্থী কর্মীরা বেরিয়ে গিয়ে ইউ টি ইউ সি গঠন করল তারা অবশ্য কমিউনিস্ট কর্মীদের অনুপস্থিতির সামান্য সুযোগই গ্রহণ করতে পেরেছিলো। এই প্রতিষ্ঠানটি আর এস পি-র নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল। এদের সংগঠন কেরালা এবং পশ্চিমবংগের কিছু বাগিচা এলাকা ছাড়া অন্য শিল্পে খুব সামান্যই গড়ে উঠেছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের অনুপস্থিতি এবং শ্রমিক আন্দোলনে ভাঙনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর কমিউনিস্ট কর্মীরা একে একে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন তাদের ওপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কংগ্রেস সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়। কমিউনিস্ট কর্মীরা বেরিয়ে আসার পর এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সুরু হয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের সংগ্রাম। ঠিক এইভাবে ইতিপূর্বে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের প্রশ্নটি এতো জরুরী হয়ে ওঠেনি। এখানে উল্লেখ করা দরকার ১৯৪৮-৪৯ সালে শ্রমিকদের মধ্যে সর্বস্তরে বিভেদ সৃষ্টি করা সত্বেও শ্রমিক-শ্রেণী কিন্তু সংগ্রাম থেকে দূরে থাকেনি। এই সময়ের মধ্যে শিল্প বিরোধ অর্থাৎ ধর্মঘট ও লক-আউটের সংখ্যা এবং তজ্জনিত নষ্ট শ্রম দিবসের সংখ্যা দেখলেই তা বোঝা যায়।

১৯৪৮-৫১ সালে শ্রমবিরোধ

বছর	ধর্মঘট ও লক্‌আউট সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা	নষ্ট কাজের দিন
১৯৪৮	১৬৩৭	১,৩৩২,১৫৬	৭,২১৫,৪৫৬
১৯৪৯	৯১০	৬৮৫,৪৫৭	৬,৬০০,৫৯৫
১৯৫০	৮১৪	৭১৯,৮৮৩	১২,৮০৬,৭০০
১৯৫১	১,০৭১	৬৯১,৩২১	৩,৮১৮,৯২৮

[সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইতিহাস—গোপাল ঘোষ, পৃষ্ঠা ৪০—৪১ হইতে গৃহীত]

এই সময় ১৯৪৮ সালে সুতা কলে বড় বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়কার মাদ্রাজ প্রদেশে কোয়েম্বাটুরে সুতা কল শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল উল্লেখযোগ্য। এই ধর্মঘটে ২৩ হাজার শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় তিন মাস ধর্মঘট স্থায়ী ছিলো এবং ১৯ লক্ষ কাজের দিন বিনষ্ট হয়েছিলো। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বম্বের সিল্ক মিলে ৯৫০০ শ্রমিক, বোনাস ও মজুরী ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির দাবী নিয়ে ধর্মঘট করেন। একই সময় চটকলে ৪৬টি বিরোধের কথা জানা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ছিলো ১৪৩টি। স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করে এবং কমিউনিস্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

১৯৪৮ সালে ২৫শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকশত কর্মী কলকাতা এবং জেলাগুলিতে গ্রেপ্তার হয়ে গেলো। গ্রেপ্তার হয়ে যায় কমিউনিস্ট পার্টির বহু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। মাদ্রাজে পার্টি বে-আইনী হয়ে গেলো এবং সেখানেও ঠিক এই ভাবেই বহু ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেপ্তার হলেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু কমিউনিস্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেস এবং মালিকরা ঠিক এই সুযোগটাই গ্রহণ করেন এবং প্রদেশে প্রদেশে প্রতিটি কলে কারখানায়, বন্দরে ও খনিতে অথবা বাগিচাগুলিতে মালিকরা নিজেদের উদ্যোগে ইউনিয়ন গড়ে তুলে রেজিষ্ট্রি করার জন্য পাঠাতে আরম্ভ করেন। যেসব সংস্থায় শ্রমিকদের কোনও ইউনিয়ন ছিলনা সেসব জায়গায়তো মালিকরা নতুন ইউনিয়ন গড়ে তুললই, যেখানে শ্রমিকদের ইউনিয়ন বর্ত্তমান ছিলো সেসব জায়গায়ও আরেকটি করে ইউনিয়ন গঠিত হলো এবং আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত করা হোল। কলে কারখানায় প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজে মালিকরা বরাবরই পুলিশ এবং কংগ্রেস সরকারগুলোর আমলাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়ে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই যেসব কারখানায় শ্রমিকদের ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে, সাধারণ শ্রমিকরা সেইসব প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কি চোখে দেখত তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে তৎকালে যারা রাজনীতিগতভাবে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন ছিলো তারাও এইসব ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কাজ কর্ম দেখে এদের ওপরে বিশেষ বিশ্বাস রাখতে পারেনি। তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে যে, মালিকদের সৃষ্ট আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের নেতারা মালিকদের স্বার্থরক্ষার ওপরে বেশী জোর দিতো। এইসব নেতারা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে হয় সরাসরি বিরোধিতা করতো, নয়তো তা নিয়ে আন্দোলনের বদলে চুপ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করতো। আই এন টি ইউ সি-র জন্মকালের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত যে ধারাটি চলে আসছে তা হোল, শ্রমিকদের পিছনে অর্থাৎ শ্রমিকদের না জানিয়ে হয় মালিকের সঙ্গে সরাসরি অথবা

লেবার দপ্তর মারফৎ শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার তথাকথিত মীমাংসা করে নেওয়া। অবশ্য এর অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত সেই মীমাংসা মানতে অস্বীকার করতো। অবশ্য যেসব জায়গায় অথবা শিল্পে তদানীন্তন এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়ন ছিলনা এবং একমাত্র আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়ন ছিলো, সেসব জায়গায় সাধারণ শ্রমিকরা আই এন টি ইউ সি-র কর্মকর্তাদের দালাল আখ্যা দিলেও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী তথাকথিত মীমাংসাগুলিকে মানতে বাধ্য হোত পুলিশ, মালিক এবং কংগ্রেস সরকারের চাপে। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হোল আসামের বিস্তৃত চা বাগানগুলির শ্রমিকদের অবস্থা। এখানে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ভাঙতে কংগ্রেসী সরকারগুলির ভূমিকা

১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই বোম্বাই প্রদেশে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার বোম্বাই ইন্ডাসট্রিয়াল রিলেশন অ্যাক্ট (বি আই আর অ্যাক্ট) নামক একটি আইন পাশ করেছিলো। এই আইনে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারকে সংকুচিত করা হয়; এর দ্বারা বাধ্যতামূলক সালিশি ব্যবস্থাকে আরো পাকাপোক্তভাবে ইউনিয়নগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই আইন অনুযায়ী সরকারের শ্রম দপ্তর মালিকের এবং সরাকারের মর্জি অনুযায়ী যে কোনও ইউনিয়নকে স্বীকৃত ইউনিয়ন বলে ঘোষণা করতে পারত। এই তথাকথিত স্বীকৃত ইউনিয়নের সঙ্গে মালিক যে চুক্তি করবে সে চুক্তির সর্ত সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী মানতে বাধ্য থাকবে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তদানীন্তন বোম্বাই প্রদেশে ভারতীয় মালিকশ্রেণীর কলকারখানার সংখ্যাই ছিলো বেশী এবং শ্রমিক

আন্দোলনে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী ছিলো সারা ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাদের সংগ্রামের কথা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে শ্রমিকরা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতেন। ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী শুধু যে ধর্মঘট করে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তাই নয়, রাস্তায় রাস্তায় পুলিস ও সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ চালিয়েছিলেন, যা দেখে কমরেড লেনিন বলেছিলেন– ভারতের শ্রমিকরা রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠছে। ১৩ই জুলাই থেকে তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে ধর্মঘট শুরু হয় সেটা বিস্তার লাভ করতে করতে ২৩শে জুলাই থেকে ২৮শে জুলাইয়ের মধ্যে এক সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিস এবং সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় ২০০ জন শ্রমিক নিহত হন এবং বহুলোক আহত এবং গ্রেপ্তার হন।

বোম্বাইয়েব শ্রমিকশ্রেণী স্বাধীনতা স'গ্রামে অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। রাজনৈতিক ধর্মঘটের পর ধর্মঘট করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পেরেছিলো।

এই বোম্বাইয়েব শ্রমিকশ্রেণী ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক এক মাস পর ২রা অক্টোবর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। ৯০ হাজার শ্রমিক রাজনৈতিক ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ করেছিলেন। কমরেড রজনী পাম্ দত্ত বলেছিলেন "আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইহাই প্রথম যুদ্ধ-বিরোধী ধর্মঘট।" মহাযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার শ্রমিক ১৯৪০ সালে ৫ই মার্চ থেকে মহার্ঘ ভাতার দাবী জানিয়ে ধর্মঘট আরম্ভ করেছিলেন। এই ধর্মঘটের সমর্থনে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক ১০ই মার্চ তারিখে একদিনের সাধারণ ধর্মঘট করেছিলেন।

"বোম্বাই ধর্মঘট সারা দেশব্যাপী এক ধর্মঘট প্রবাহের উৎস মুখ খুলিয়া দিয়াছিলো" (আজিকার ভারত—রজনীপাম দত্ত 'নির্বাচিত অংশ')

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন। এগুলির মধ্যে বৃহত্তমটি অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে। তাছাড়া ঐ বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কানপুর, পাটনা, ঝরিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রে যুদ্ধ-বিরোধী ধর্মঘট হয়। ১৯৩৯ সালে মোট ১১০টি ধর্মঘটে ১ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিক যোগ দিয়েছিল।

এই অবস্থায় আতঙ্কিত কংগ্রেস সরকার এবং দেশী বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক আন্দোলনে দালাল ইউনিয়নের সৃষ্টি করে শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এটাই ছিলো স্বাভাবিক এবং সেই উদ্দেশ্যেই বি আই আর অ্যাক্ট প্রবর্ত্তন করা হয়। এই বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ১৯৪৭ সালে আই এন টি ইউ সি-র সৃষ্টি করার এক বছর পূর্বে থেকেই শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলনের তদানীন্তন পীঠস্থান বোম্বাই প্রদেশে। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বোম্বাই, ইন্‌ডাসট্রিয়াল রিলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী মালিক এবং সরকার যে ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেবে তার সঙ্গে ছাড়া অন্য কোন ইউনিয়নের সঙ্গে মালিক বা সরকার কোন চুক্তি করতে পারবেনা, যাতে করে শ্রমিকরা দালাল ইউনিয়নের চুক্তি মানতে বাধ্য হয়। এর নিকৃষ্ট একটি উদাহরণ ইদানিংকালে দেখা গেছে। আই এন টি ইউ সি-র বাইরে আরেকটি ইউনিয়নের আহ্বানে বোম্বাইয়ের ৬২টি সূতাকলের আড়াই লক্ষ শ্রমিক সর্বাত্মক দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ ধর্মঘট করা সত্ত্বেও শ্রমিকদের এই প্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়নের সঙ্গে মালিকরা বা সরকার কেউই কোন আলোচনা বা মীমাংসা করতে অস্বীকার করে। এই শ্রমিকদের কিছু অর্থনৈতিক দাবী

দাওয়া ছাড়া অন্য যে মূল দাবী ছিলো সেটি হোল বি আই আর অ্যাক্ট বাতিল করা এবং শ্রমিকদের ব্যালট ভোটের মারফৎ ইউনিয়নের স্বীকৃতির প্রশ্নের মীমাংসা করা। সরকার এই দাবী মানতে সরাসরি অস্বীকার করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ইউনিয়নটি কোন কমিউনিস্ট বা বামপন্থী পরিচালিত ইউনিয়ন নয়, অথবা কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়। এটি একটি-ব্যক্তি পরিচালিত ইউনিয়ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার বা মালিকরা এই ইউনিয়নের সঙ্গে কোন চুক্তি বা মীমাংসা করতে রাজী হয়নি। তার কারণ স্বাভাবিক ভাবেই, যতক্ষণ না এই ব্যক্তি নিজেকে আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করছে অথবা কংগ্রেস সরকার এবং মালিকদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করছে ততদিন পর্যন্ত এর সঙ্গে কোন চুক্তি করার প্রশ্ন তারা ভাবতেই পারেনা। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে দেখা গেলো যে আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সঙ্গে বম্বের বস্ত্র শিল্পের একজন শ্রমিকও না থাকা সত্ত্বেও সেই ইউনিয়নটি একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়ন থেকে গেলো এর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং কংগ্রেস সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ভাঙতে কতোটা নির্লজ্জ এবং মরিয়া হয়ে উঠতে পারে।

বম্বের পরেই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ছিলো ঐক্যবদ্ধ এবং তীব্র। চটকল শ্রমিকরা ত্রিশের দশকের পূর্ব থেকেই বার বার ইংরেজ মালিকদেব বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করে এসেছে। চটকল শিল্পের আন্দোলনের ইতিহাসে ঐক্যের প্রশ্নটি শ্রমিকদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হবার পর কারখানার পর কারখানার মধ্যে এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বী আই এন টি ইউ সি ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং সেই ইউনিয়নগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চটকল

মালিক সমিতি সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আই এন টি সি-কে দিয়েই চটকল শ্রমিকের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়।

চটকল শ্রমিকদের মধ্যে আবার কি করে ঐক্য গড়ে তোলা হোল সেটা পরবর্তী অধ্যায়ে লিখব।

একইভাবে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য কংগ্রেস এবং মালিকরা গড়ে তুলতে পেরেছিলো কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করে এবং তাদের কর্মীদের গ্রেপ্তারের সুযোগ নিযে। পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ঐক্যের প্রশ্নটা ১৯৫২ সাল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হযে ওঠে। চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সুতা-কলের শ্রমিকদের মধ্যে পুনরায ঐক্য গড়ে তোলা খুবই কঠিন ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলাব প্রচেষ্টা শিল্প হিসেবে প্রথম সাফল্য লাভ করে ১৯৫৫ সালে।

১৯৫০ সালে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

এরপর ৫২ সাল থেকে বিনা বিচারে রাজবন্দীদেব ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস সরকার মুক্তি দেয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও ঐ সময় আস্তে আস্তে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট কর্মীরা মুক্ত হয়ে প্রথমেই শ্রমিকদের ঐক্যের কাজে হাত দেন। ৫২ সালের শেষের দিকে, কোলকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে এ আই টি ইউ সি-র কর্মীদের এক কনভেনশনে ট্রেড ইউ-নিয়নের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। কন্‌ভেন্‌শন থেকেই আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস এবং ইউ টি ইউ সি-র কাছে আবেদন জানানো হয় যাতে তারা সবাই আবার এ আই টি ইউ সি-তে যোগ দিয়ে তাকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে

পরিণত করেন। এই উদ্দেশ্যে এই কনভেন্শনের কয়েকদিন পরেই এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে একটি সভায় মিলিত হবার আহ্বান জানানো হয়। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুয়ে মারওয়াড়ী ছাত্র নিবাসে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইউ টি ইউ সি ছাড়া অন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন ঐ সভায় যোগদান করেনা। ইউ টি ইউ সি-র প্রতিনিধিরা যদিও ঐ সভায় উপস্থিত হন, তবুও এ আই টি ইউ সি-তে ফিরে আসতে তারা অস্বীকার করেন। ঐ সভায় এ আই টি ইউ সি-র নেতা এস. এ. ডাঙ্গে নিজে উপস্থিত থেকে অতীতের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে বা ভুলে গিয়ে ইউ টি ইউ সি-র কাছে আবেদন জানান যাতে তারা আবার এ আই টি ইউ সি-তে ফিরে আসে। কিন্তু ইউ টি ইউ সি-র প্রতিনিধিরা তাদের পৃথক সংগঠন রাখার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তবে তাঁরা বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে যুক্ত আন্দোলন করতে রাজী হন।

১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভেঙ্গে যাওয়া সুতা কলের ইউনিয়ন, চটকলের ইউনিয়ন. চা-বাগানের ইউনিয়নগুলোর পুনর্গঠনে কমিউনিস্ট কর্মীরা প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

শ্রমিক আন্দোলনে আবার ঐক্যের প্রচেষ্টা ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন এবং তারপরে পরেই কলকাতার মারওয়াড়ী ছাত্র নিবাসে এ আই টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি এবং অন্যান্য ফেডারেশনগুলোর সভার পরেই ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যের প্রশ্ন নিয়ে সারা ভারত জুড়ে প্রদেশে প্রদেশে এ আই টি ইউ সি-র কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়ে কাজে নেমে পড়েন। ঐ প্রচেষ্টার ফলে ১৯৫৩, '৫৪ এবং '৫৫ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিরাট বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিক

থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলো আবার সচল এবং সজীব হয়ে ওঠে।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কমিউনিস্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার এবং তাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোবার পরে কংগ্রেস সরকার ও মালিকদের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন শিল্পেই আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়নগুলি খুব বেশী শ্রমিকদের সভ্য করতে পারেনি।

কমিউনিস্ট কর্মীরা জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে দলে দলে শ্রমিকরা আবার এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়নগুলির সভ্য ভুক্ত হয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩, '৫৪; '৫৫ এই তিন বছরে এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্বে বিরাট বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯৫৩ সালে প্রথম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হয় জুলাই মাসে কোলকাতা শহরে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে কমিটি সংগঠিত হয়েছিল সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রয়াত ডাক্তার সুরেশ ব্যানার্জী। সংযুক্ত কমিটিতে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও তদানীন্তন কৃষক প্রজা (পরবর্তীকালে পি এস পি) পার্টির সভাপতি সুরেশ ব্যানার্জী। এই সংযুক্ত কমিটি ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন পরিচালনা করেন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বি পি টি ইউ সি, এইচ এম এস এবং ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কর্মচারী ফেডারেশনগুলি। ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন চলাকালীন বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী (ইস্‌কো)-র শ্রমিকরা হট মিল বোনাসের দাবীতে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইস্‌কোর শ্রমিকদের এই আন্দোলন ভাঙার জন্য মালিকরা গুণ্ডা দিয়ে ৫ই জুলাই এক বিরাট শ্রমিক মিছিল ভাঙার চেষ্টা করে। শ্রমিকরা সভা থেকেও গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দেয়। তখন পুলিশ এসে শ্রমিকদের

ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়—ফলে সাত জন শ্রমিক এই গুলিতে নিহত হয়। বার্ণপুরে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে আসানসোলে ৬ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘট হয়। পরবর্তীকালে ১৫ই জুলাই এই হত্যাকাণ্ড এবং কোলকাতার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বি পি টি ইউ সি, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি এবং অন্যান্য কর্মচারী ফেডারেশনগুলি মিলিতভাবে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। কমিউনিস্ট পার্টি, পি এস পি, আর এস পি প্রভৃতি এই ধর্মঘটের সমর্থনে জনসাধারণকে ঐদিন হরতাল পালন করারও আহ্বান জানান। ধর্মঘট ও হরতাল সম্পুর্ণ সফল হয়। অবশ্য ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের তদানীন্তন নেতৃত্বেব একটি প্রভাবশালী অংশ হরতালের দিন ট্রাম চালানর সিদ্ধান্ত নেওযায় ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তির স্থষ্টি হয এবং জনসাধাবণের মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। এটাও উল্লেখ্য যে এই ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনের সমর্থনে সংযুক্ত কমিটি ১৪৪ ধাবা ভঙ্গ করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রোগ্রাম নেয়। কংগ্রেস সরকার এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য পুলিস দিযে সত্যাগ্রহীদের ওপর নৃশংস এবং বর্বর অত্যাচার চালায়, মনুমেণ্ট ময়দানে আহূত সভা বেআইনি ঘোষণা করে এবং পুলিশ মানুষের ওপর নৃশংসভাবে লাঠিচালনা করে। সেই সভায় উপস্থিত বি পি টি ইউ সি-র সভাপতি এবং মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ও রাজ্যসভার সদস্য সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার নিজে চুল ধরে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলে দেয়। এ সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ চলতে থাকে—এই অবস্থায় শ্রমিক-শ্রেণীর সামনে প্রশ্ন আসে এই আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য অন্য কোন রাস্তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই আন্দোলনের প্রকৃত রূপ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার বিলাতী কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে ভাড়া বৃদ্ধি চালু

করার জন্য জনগণের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। ট্রাম শ্রমিকরা যাতে এই আন্দোলনে যোগদান না করে তারজন্য তাদের বোনাস এবং বেতন বৃদ্ধির প্রলোভন দেখানো হয়। ট্রাম শ্রমিকদের বলা হয় যে, যদি এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করতে তারা সাহায্য করে এবং যদি ভাড়া বৃদ্ধি করা যায় তবে তাদের বোনাস দেওয়া হবে এবং বেতনও বৃদ্ধি করা হবে। এই অবস্থায় ট্রাম শ্রমিকদের এই আন্দোলনে সমর্থন জানানো খুবই দুরুহ ব্যাপার ছিলো। কারণ এই আন্দোলন ছিলো আপাতদৃষ্টিতে ট্রাম শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধী। ট্রাম শ্রমিকদের সামনে প্রশ্ন ছিলো, তারা কি কংগ্রেস সরকার এবং বিলাতী মালিকদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে বোনাস ও বেতন বৃদ্ধির প্রলোভনে পা দিয়ে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন? নাকি ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জনসাধারণের সাহায্যে তাদের দাবীর সংগ্রামে জয়যুক্ত হবেন। ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষে এই বিষয়ে কোনও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন কাজ ছিলো সন্দেহ নেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রামের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেন। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং তাদের বেতন ও বোনাসের দাবীতে এই লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। ট্রাম শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘটের ফলে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনের চরিত্র সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়, আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে আসে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাকালীন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অফিস কর্মচারীরা, যারা শিয়ালদা, হাওড়া স্টেশন থেকে অফিস পাড়ায় হেঁটে যেতেন, তাঁরা দল বেধে স্লোগান দিতে দিতে যেতেন, 'বাসে যাব, হেঁটে যাব, তবুও ট্রামে চড়বনা।' বস্তুতপক্ষে ট্রাম বয়কটের আহ্বানে জনসাধারণ অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিলেন। ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটের পূর্ব পর্যন্ত জনসাধারণের খুব সামান্য অংশই ট্রামে চড়তেন—

ট্রামগুলো প্রায় খালি যাতায়াত করতো। এতদসত্ত্বেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনটা একটু স্তিমিত হয়ে পড়ছিলো। ঠিক তখনই ট্রাম শ্রমিকরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট ১৫ দিন চলার পর সরকার এবং বিলেতি ট্রাম কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত জন-সাধারণের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ তুলে নেওয়া হয়, কিন্তু ট্রাম শ্রমিকদের বেতন বা বোনাস সম্পর্কে ট্রাম কোম্পানী কোন উচ্চবাচ্যই করেনা। এই সময় ট্রাম শ্রমিকদের কাছে প্রশ্ন আসে তারা ধর্মঘট তুলে নেবে, নাকি বেতন এবং বোনাসের দাবীতে ধর্মঘট চালিয়ে যাবে। তখন ধর্মঘট আরো চালিয়ে যাবার অর্থ একদিকে জনসাধারণের যাতায়াতে প্রচণ্ড অসুবিধে, যা তারা গত দেড় মাস যাবত ভোগ করছিলেন, আর অন্য দিকে শ্রমিকদের ধর্মঘট সময়কালীন বেতন না পাওয়া। এই সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে ধর্মঘট তুলে নেবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ট্রাম শ্রমিকদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত সুরেশ ব্যানার্জী। সভায় বি পি টি ইউ সি এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রনেন সেন এবং অন্যান্য নেতারা। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সমস্ত বিচার বিবেচনার পর সভায় ট্রাম ধর্মঘট তুলে নেবার প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে একটা অংশ বোনাস এবং বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি না পেলে ধর্মঘট তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে থাকেন। শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশঃ বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় এবং উপস্থিত নেতৃত্ব সে বিক্ষোভকে সামাল দিতে না পারায়, কমরেড জ্যোতি বসুকে সভায় নিয়ে আসা হয়। কমরেড জ্যোতি বসু সভায় এসে শ্রমিকদের বলেন বোনাস এবং বেতন বৃদ্ধির সম্পর্কে তিনি সেই দিনই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন

এবং আলোচনার ফলাফল সেইদিনই বিকেলে ঘোষণা করে দেবেন। ডাঃ বিধান রায় এবং ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনার পর বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নটি সরকার ট্রাইব্যুনালে দিতে রাজী হয় তবে বোনাস সরাসরি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতি পাবার পর, পরদিন সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ দান করে।

শ্রমিক ও জনসাধারণের ঐক্যের প্রথম নক্সার

স্বাধীনতা অর্জনের পর শ্রমিকশ্রে জনসাধারণের স্বার্থে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একটি সংস্থায সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সফল ধর্মঘট করার নজীব এটাই ছিলো প্রথম। শ্রমিক ও জনসাধারণের ঐক্যেরও এটা ছিল স্বাধীনতা উত্তরযুগের প্রথম নজীর। এখানে উল্লেখ্য যে ট্রাম শ্রমিকের সংগঠন কমিউনিস্ট কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত ছিলো। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হবার পর কংগ্রেস সরকার এবং বিলাতী মালিকের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নামমাত্র কিছু শ্রমিক আই এন টি ইউ সি র অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলিতে যোগদান করেন। ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় ওরাও যোগ দেন। কংগ্রেস সরকারের ও মালিকের সমস্ত বিভেদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ট্রাম শ্রমিকদের ঐক্য আবার দৃঢভাবে গড়ে ওঠে।

ছাঁটাই ও বেকারী বিরোধী সংগ্রাম

যুদ্ধোত্তর কাল থেকে শুরু করে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৫১, '৫২, '৫৩ সাল নাগাদ এই ছাঁটাইয়ের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বি পি টি ইউ সি'র উদ্যোগে, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি এবং কর্মচারী ফেডারেশনগুলির মিলিত আহ্বানে এলাকায়

এলাকায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্যব্যাপী ছাঁটাই এবং বেকারী বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাঁটাই ও বেকারী বিরোধী কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটির যুক্ত আহ্বায়ক ছিলেন হিন্দ মজদুর সভার পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবেন সেন এবং বি পি টি ইউ সি-র অন্যতম সম্পাদক মনোরঞ্জন রায়। এই সব ছাঁটাই বিরোধী সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এইচ এম এস এবং ইউ টি ইউ সি-র উপলব্ধি করার অন্যতম কারণ ছিলো তাদের নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, যার ফলে তাদের কারোরই একার পক্ষে বড় আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা ছিলনা। শ্রমিকরাও খুব কম সংখ্যকই তাদের সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। আমরা আগেই বলেছি যে এ আই টি ইউ সি ভেঙ্গে আই এন টি ইউ সি গঠিত হবার পর সরকার এবং মালিকদের প্রচেষ্টা ছিলো আই এন টি ইউ সিকে শক্তিশালি করা, এইচ এম এস বা ইউ টি ইউ সি-কে নয়। ১৯৫২ সালে দেখা গিয়েছিল ইউ টি ইউ সি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের চা বাগানের এবং প্রেসের একটি অংশের শ্রমিকদের সংগঠিত করতে পেরেছিলো। এইচ্ এম এস অবশ্য চা বাগান এবং কয়লা খনিতে দু'জায়গাতেই সাংগঠনিক শক্তি গড়তে পেরেছিলো।

১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট কর্মীরা জেল এবং আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর সমস্ত শিল্পে, কারখানায়-কারখানায়, কয়লা খনিতে বা চা বাগানে একদিকে যেমন ইউনিয়নগুলোর পুনর্গঠন কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন আরেকদিকে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আওয়াজ নিয়ে শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত হন। '৫২ সালের মধ্যে সুতা কল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রায় সমস্ত কারখানাগুলোতে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে রাজ্যব্যাপী

সুতাকল শ্রমিকদের একটি ফেডারেশন গঠিত হয়। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মনোরঞ্জন রায় এবং এস এ ফারুকি ছিলেন সভাপতি। সমস্ত কারখানার সুতাকল শ্রমিকদের সম্মিলিত করা তখনও সম্ভব হয় নি। '৪৮ সালের ২৪শে মার্চ বাসন্তী কটন মিলের শ্রমিকদের আন্দোলন কংগ্রেস সরকার গুলি চালিয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। তারপরে বাসন্তী কটন মিলের শ্রমিকদের '৫৩ সালে আবার সংগঠিত করে ইউনিয়নটি বি পি টি টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। আই এন টি ইউ সি ওদের কিছু শ্রমিককে সংগঠিত করতে পেরেছিলো। কেশোরাম কটন মিলেও বিড়লার গুণ্ডা বাহিনী শ্রমিকদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যেতো। আই এন টি ইউ সি ছাড়া অন্য কোন ইউনিয়নের সভ্য হলেই সেই শ্রমিককে মারতে মারতে কারখানা থেকে বের করে দিতো। বি পি টি ইউ সি'র নেতত্বের পক্ষ থেকে কমলাপতি রায়, ভবানী রায়চৌধুরী প্রভৃতি কেশোরামে গেট মিটিং করতে গিয়ে অনেকবার গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। ডানবার কটন মিলে তখনও বি পি টি ইউ সি'র শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এছাড়া রাজ্যের প্রায় আর সব সুতাকলেই '৫২ সাল থেকে প্রচেষ্টার ফলে শ্রমিকদের বি পি টি ইউ সি-র ইউনিয়নগুলি সংগঠিত করা গিয়েছিলো। ফেডারেশনটি গঠিত হবার পরে সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে আবার নতুন উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

ঐ সময় অর্থাৎ ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শিল্প এবং শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে নব গঠিত সুতাকল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকাটিতে ১৯৪৮ সালে সুতাকল শিল্প ট্রাইব্যুনাল কি ভাবে অসত্য যুক্তি দিয়ে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিকে অস্বীকার করেছিল তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ট্রাইব্যুনালের রায় ছিল মালিকের স্বার্থে। ১৯৪৮ সালের ট্রাইব্যুনালের

রায় অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সুতাকল শ্রমিকের বেতন খুব সামান্যই বেড়েছিলো, তাও মালিকরা নানা অজুহাতে কমিয়ে দেয়। আবার যখন শ্রমিকদেব পক্ষ থেকে নতুন করে ট্রাইব্যুনাল বসাবার দাবি উঠল, মালিকবা সরকারকে জানালেন—আমরা তো গত ট্রাই-ব্যুনালের রায় মানতে রাজীই আছি। আর শিল্পে যখন সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে তখন আবার নতুন করে ট্রাইব্যুনাল বসিযে গোলমাল সৃষ্টি না কবতে মালিকরা সরকারকে অনুরোধ করে। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শ্রমিকদের বেতন ছিল ভারতে অন্যান্য রাজ্যের সুতাকল শ্রমিকদের চাইতে কম। যেখানে বোম্বাইয়ের একজন অদক্ষ শ্রমিকের বেতন ছিল ৯১ টাকা বারো আনা, আহমেদাবাদে ৮ টাকা—সেখানে পশ্চিমবঙ্গে একজন শ্রমিক পেত মাত্র ৫০ টাকা ১৫ পয়সা আর একজন মেয়ে শ্রমিক পেতেন ২৫ টাকা ১২ পযসা। বোম্বাই-এর একজন শ্রমিক দু'খানা তাঁতের জন্য যেখানে পেত ১১৬ টাকা ৭৫ পয়সা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে একজন তাঁতী পেত ৬৬ টাকা ১২ পয়সা।

অন্যদিকে মুনাফাব হার তুলনামূলকভাবে দেখলে বোম্বাইয়েব তুলনায় পশ্চিমবঙ্গেব অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের ৭টি সুতাকল—বাসন্তী, বাউরিয়া, ডানবার, কেশোরাম, বঙ্গলক্ষ্মী, রামপুরিযা এবং মোহিনী ১৯৫০ সালে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মূলধনের উপর ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার অর্থাৎ শতকবা ৬৪ ভাগেব উপর মুনাফা করেছে। ঐ বছর বোম্বের সবচেয়ে বড় ৪টি মিল—বোম্বে ডায়িং, সেঞ্চুরী, কোহিনুর ও ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ১০ কোটি টাকার মূলধনের উপর ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা সাড়ে ২২ ভাগ হারে মুনাফা করেছে। অথচ দক্ষতা কম এই অজুহাতে বোম্বের শ্রমিকদের চাইতে পশ্চিবঙ্গের সুতাকল শ্রমিক মাসে ৪১ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত কম পেতো।

উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি সংযুক্ত করে ট্রাইব্যুনালের

একটা সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও মালিকরা ট্রাইব্যুনালের রায়ের এই অংশটি কার্যকরী করেনি। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলির মাসিক গড়পড়তা উৎপাদন ছিল ',৩৬,৬৬,০০০ গজ কাপড়, আর ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত উৎপাদনের গড় ছিল ১,৪৭,৫৪,০০০ গজ কাপড়। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন কথাবার্তাই মালিকরা বলতে রাজী ছিল না। ১৯৪৮ সালের পর শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর সুতাকল মালিকরাও সরকারের সহায়তায় অন্যান্য শিল্পের মালিকদের মতই শ্রমিকদের উপর আক্রমণ শুরু করেছিল। এ বিষয়ে কেশোরামের মালিক বিড়লা ব্রাদার্স ছিল সবার উপরে। ফ্যাক্টরী আইনও এই মালিক নির্বিচারে ভঙ্গ করে চলেছিল। শ্রমিকদের আইনতঃ পাওনা ছুটিও কেটে নেওয়া হচ্ছিল। ৮ ঘণ্টা কাজের ফাঁকে মাত্র ১৫ মিনিট ছুটি দেওয়া হ'ত। মালিক সৃষ্ট আই এন টি ইউ সি ছাড়া অন্য কোন ইউনিয়নে কোন শ্রমিক যোগ দিয়েছে জানা মাত্র সেই শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হত। এর ওপর ছিল বর্ধিত হারে কাজের বোঝা। পুস্তিকাটির শেষাংশে ঐক্যের উপর উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে লেখা হয়েছিল—

"এই অসহনীয় অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায়না এই আওয়াজ আজ কারখানায় কারখানায় শোনা যাচ্ছে। বি পি টি ইউ সি দেখিয়েছে শ্রমিকরা সরকার ও মালিকদের কাছে প্রতি-কারের জন্য আবেদন করে ব্যর্থ হয়ে কেমন করে নিজেদের একতা ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা নিজেদের দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। ঢাকেশ্বরী থেকে বাসন্তী, শ্রীদুর্গা থেকে কেশোরাম, প্রত্যেক কারখানায়ই শ্রমিকদের অতীতের গৌরবময় সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। বর্তমান সঙ্কট থেকে বাঁচতে হলে সুতাকল শ্রমিকদের সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সুতাকল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে মালিকদের বিরোধিতা

ও সরকারের নিষ্ক্রিয়তার চক্রান্ত পরাস্ত হবে, ঐ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথেই সুতাকল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে। [১৫-১১-৫২ তারিখের 'মতামত' পত্রিকায় প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শ্রমিকদের প্রতি বি পি টি ইউ সি-র ডাক" পুস্তিকা থেকে।]

'পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শ্রমিকদের প্রতি বি পি টি ইউ সি-র ডাক' শীর্ষক পুস্তিকাটি শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার পথে যথেষ্ট সাহায্য করতে পেরেছিলো। ফলে ১৯৫৩ সালে কেশোরাম কটন মিল থেকে শুরু করে সমস্ত সুতাকলে বোনাসের দাবিতে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। হুগলীর বামপুরিয়া কটন মিলের সহস্রাধিক শ্রমিক বর্ধিত হারে বোনাসের দাবিতে কারখানার ভিতর অবস্থান ধর্মঘট করে বসেছিলো। সারাদিন এই অবস্থা যাবার পর মালিকের দাবি অনুযায়ী জেলা শাসক হালদারের নেতৃত্বে এক বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কারখানার ভেতর প্রবেশ করে এবং শ্রমিকদের ওপর নির্বিচারে লাঠি চালায়। ফলে বহু শ্রমিক গুরুতররূপে আহত হয় এবং বাকি শ্রমিকদের মারতে মারতে কারখানা থেকে বের করে দেয়। এরপর মালিক কারখানায় লক্ আউট ঘোষণা করে।

অবশ্য এর আগেই ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন শিল্পে পূজা বোনাসের আন্দোলন সুরু হয়েছিল। পূজা বোনাসের দাবিতে হুগলী ডকিং ও আই জি এন আর কারখানার শ্রমিকরা প্রতীক ধর্মঘট করে। রাধেশ্যাম কটন মিলের ইউনিয়ন সেক্রেটারী বোনাসের দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর এই মিলের শ্রমিকদের বোনাসের দাবির সমর্থনে দশ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর সমাবেশ হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাধেশ্যাম কটন মিলের মালিক এক মাসের বোনাস দিতে রাজী হলে শ্রমিকদের আন্দোলনের জয় হয়। বোনাসের দাবিতে বামার লরী ও মহালক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজার ঘেরাও হয়। ট্রাইবুনালের

রায়ে বছরে ২ মাসের বোনাস দেবার আদেশ অস্বীকার করে মহালক্ষ্মী মিলের কর্তৃপক্ষ ১৯৫০-৫২ তিন বছরের জন্য মাত্র ৪ মাসের বোনাস দিতে চাওয়ায় শ্রমিকরা তা নিতে অস্বীকার করে ও ম্যানেজারকে ঘেরাও করে। দশ হাজার ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে সাত হাজার শ্রমিক বিরাট মিছিল করে বোনাসের দাবি জানায়। কীলবার্ণ কোম্পানীর শ্রমিকরা ম্যানেজারকে ঘেরাও করে দেড় মাসের বোনাস আদায় করে। ইণ্ডিয়া ফ্যানের শ্রমিকরাও এক মাসের বোনাস আদায় করে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও মার্কেন্টাইল কোম্পানীর কর্মচারীরাও বোনাসের দাবিতে আন্দোলন স্থুরু করেন। ১৯৫২ সালের ১৩ই, ও ১৪ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানীর শ্রমিকরা বোনাসের দাবিতে পানিহাটিতে বিরাট সমাবেশ ও মিছিল করে। ঐ দিনই কলকাতার মনুমেণ্ট ময়দানে বি পি টি ইউ সি-র ডাকে বোনাসের দাবিতে এক বিরাট সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বি পি টি ইউ সি-র তদানীন্তন সভাপতি সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী। বহু কারখানার শ্রমিক ঝাণ্ডা ও ফেস্টুন নিয়ে মিছিল করে সভায় যোগ দেয়। সভায় বেতন ও মহার্ঘভাতাসহ বোনাসের দাবি জানান হয়।

১৯৫৩ সালে প্রথম চটকল শ্রমিকদের মধ্যে বোনাসের দাবি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারখানায় কারখানায় বোনাসের দাবিতে চটকল শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। সমস্ত চটকল শ্রমিকরা বোনাসের দাবিতে একদিনের সাধারণ ধর্মঘট করেন। হাজীনগরে হুকুমচাঁদ চটকলের শ্রমিকরা বোনাসের দাবিতে কারখানার ভেতর অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। তখনকার দিনে হুকুমচাঁদ চটকলই ছিলো এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম চটকল। কারখানায় প্রায় চৌদ্দ হাজার শ্রমিক কাজ করতো। অবস্থানরত শ্রমিকদের যখন পুলিশ বের করে দিতে যায় তখন পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের একটি সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ গুলি চালায় এবং

বহু শ্রমিক আহত হয়। ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে বোনাস আন্দোলন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো যে আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকরাও এই আন্দোলনের বাইরে থাকতে পারেনি। এটা চটকলের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সুতা কলের আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তাই। বি পি টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি ও এইচ এস এসের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গে বোনাসের দাবিতে ৩০শে সেপ্টেম্বর '৫৩ একদিনের শিল্প ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটে মূলত চটকল শ্রমিক, সুতাকল শ্রমিক এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকরা যোগদান করে। কয়লা খনির শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিকরা এই আন্দোলনে যোগদান না করলেও তাদের মধ্যে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রভাব পড়তে শুরু করে। চটকল শ্রমিকদের বোনাসের দাবির জবাবে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বলেছিলেন যে চটকল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করা যেতে পারে কিন্তু বোনাস কখনও দেওয়া হবে না। ঐ বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর বোনাসের দাবিতে প্রচণ্ড জল ঝড় উপেক্ষা করে হাজার হাজার শ্রমিক ইণ্ডিয়ান জুটমিল এ্যাসোশিয়েসন দপ্তরের সামনে (শ্রমিকদের কাছে যে অফিস আলু গুদাম নামে পরিচিত) উপস্থিত হয়ে বোনাসের দাবি জানান। তৎকালীন বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন প্রয়াত বঙ্কিম মুখার্জী। তিনিই সেই বৃহত্তম সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ধর্মঘটের জোয়ার বয়ে যায়। ঘুসুড়িতে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কারখানার শ্রমিকরা তাদের ১৭৬ জন সহকর্মীর ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবং তাঁদের পুনর্বহালের দাবিতে ১৯৫৩ সালে ৫ই মার্চ থেকে ১১১ দিন ধর্মঘট চালিয়ে যান। ঐ মার্চ মাসেই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হয় গ্রামাফোন কোম্পানীর শ্রমিকদের। রাণীগঞ্জ

পেপারমিলের শ্রমিকরা ১৭ই মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হয় রিলায়েন্স জুটমিল, ওয়েলিংটন জুটমিল ও ওরিয়েন্ট জুটমিলে ২৪শে মার্চ তারিখ থেকে। কোলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকরা ২৭শে মার্চ তারিখ থেকে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং মহার্ঘভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেন। ঐ বছরই ২রা ডিসেম্বর তিন হাজার দর্জি আটঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেন।

টিটাগড় পেপারমিলের কারখানার আড়াই হাজার শ্রমিক আটজন ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল, চার মাসের বোনাস, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি আঠার দফা দাবির ভিত্তিতে ৫০ দিন যাবৎ লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যান। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ধর্মঘট শুরু হয় এবং ৫০ দিন চলার পর ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। ঐ বৎসরই আটই ডিসেম্বর আটজন দাঁড়ি মাঝির উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের ডাকে কোলকাতা বন্দরে আঠারো হাজার দাঁড়ি মাঝি একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে সামিল হন।

উপরে উল্লিখিত ধর্মঘটগুলি প্রায় সবই ছিলো ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে। ১৯৫১-৫৩ সালে যুদ্ধোত্তরকালে যে ছাঁটাইয়ের হিড়িক পড়েছিলো এবং বেকারী যে ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করছিলো তার বিরুদ্ধে সারা পশ্চিমবাংলায় চা-বাগান থেকে শুরু করে ইঞ্জিনীয়ারিং, সুতাকল, বিশেষ করে অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরী (প্রতিরক্ষা কারখানা) প্রভৃতি সর্বত্রই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২১-২২ ফেব্রুয়ারী ছাঁটাই ও বেকারী-বিরোধী কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে এবং প্রকাশ্য সম্মেলন হয় মনুমেণ্ট ময়দানে। এই কমিটির নেতৃত্বে ছাঁটাই ও বেকারীবিরোধী আন্দোলনকে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ দেবার প্রচেষ্টা হয়।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে মনোরঞ্জন রায় লিখিত এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকাটির প্রথম পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে—"গত তিন মাসে পশ্চিমবাংলায় বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার চৌত্রিশ হাজার সুতাকল শ্রমিকের মধ্যে ছয় হাজার শ্রমিককে হয় ছাঁটাই করা হয়েছে নয় ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যের ২৫টি চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চল্লিশ হাজার বাগিচাশ্রমিক সম্পূর্ণ বেকারে পরিণত হয়েছে। কতকগুলি বাগানের কয়েক সহস্র শ্রমিককে ছাঁটাই করে অল্প শ্রমিক দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার সমস্ত চা বাগানেরই অবশিষ্ট শ্রমিকদের কাজের দিন কমিয়ে দেওয়ার ফলে (সপ্তাহে ৫ দিন) আধা-বেকারে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সম্পূর্ণ ও আধা বেকার চা শ্রমিকের সংখ্যাই প্রায় ৩ লক্ষ।

র‍্যাশনালাইজেশনের নামে পঞ্চাশ হাজার চটকল শ্রমিকের সামনে ছাঁটাই এর খড়্গ ঝুলছে—এদের মধ্যে কয়েক সহস্র শ্রমিককে ইতিমধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে।

রেল, কয়লাখনি, গালার কারখানা, জুতা ও রবার কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং, হোসিয়ারী ও বেল্টিং কারখানার কয়েক সহস্র শ্রমিককে সম্পূর্ণ অথবা আধা বেকারে পরিণত করা হয়েছে। এই সমস্ত শিল্পের অফিসের কর্মচারীদের বেপরোয়া ছাঁটাই করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আঘাত এসে পড়েছে তাঁতী, ধাতুশিল্পী, কামার, বিড়ি শ্রমিক ইত্যাদির উপর।"

ঐ পুস্তিকাতে সরকারি নীতির, যার ফলে ছাঁটাই ও বেকারী সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠেছিলো, কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিলো। শ্রেণী বিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছাঁটাই ও বেকারী যে

অবশ্যম্ভাবী পুস্তিকাটিতে, তত্ত্বগতভাবে তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছিলো। এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ সংগ্রামেরও বিবরণ দেওয়া হয়েছিলো। সর্বোপরি এই আন্দোলনে ঐক্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে পুস্তিকাটিতে লেখা হয—

(১) "আন্দোলনের সংযোগ সাধনের জন্য যে কোন কেন্দ্রীয ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং দোকান কর্মচারী সংঘ মধ্যবিত্তদের অর্থাৎ—শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, কুটির শিল্পী প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থানীয় কমিটি গঠন করতে হবে। কারখানায় কারখানায় ছাঁটাই বিরোধী কমিটি গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও তাদের কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে।

"দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে এই আন্দোলনের পিছনে টেনে আনতে হবে। বেকার সমস্যার আঘাত এদের উপর এসে পড়ায় এরা সহজেই এগিয়ে আসবে। কিষাণ সভা, মহিলা সংগঠন, ক্লাব প্রভৃতি গণ সংগঠনের কাছে বেকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যেতে হবে।

"কর্মরত ও বেকার শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি ও মৈত্রী ভাব গড়ে তোলার জন্য ঐক্যবদ্ধ সভা, সমাবেশ ইত্যাদির খুবই দরকার। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন না হলে বেকার তার আন্দোলনে আত্মবিশ্বাস পাবে না এবং কর্মরত শ্রমিকদেরও সর্বদা ভয় থাকবে মালিক কর্তৃক এই বিরাট বেকার বাহিনী তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওযার।"

ঐ পুস্তিকাটিতে শেষের দিকে একটি তৎকালীন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে—

"বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এই যে পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-শ্রেণী অভূতপূর্বভাবে কৃষকদের বিভিন্ন দাবি, বিশেষ করে ভূমি সংস্কারের দাবি নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। তাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছে যে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে না পারলে—বর্তমান সংকটের সমাধান করা সম্ভব নয়।" পুস্তিকাটি ঐক্য সম্পর্কে, আরো লিখছে—"সুতরাং প্রশ্ন এই নয় যে শ্রমিকশ্রেণী সাফল্যের সাথে তাদের উপর হামলা রুখতে পারবে কি পারবে না। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কতটা সাফল্যের সাথে ঐক্য গড়ে তুলতে পারবো, কর্মরত ও বেকারদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে পারবো, কত দ্রুত জনসাধারণের অন্য অংশ, কৃষক ও মধ্যবিত্তকে আন্দোলনে টেনে আনতে পারবো। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন আরম্ভ করেছে—তাদের আন্দোলনের মধ্যে যোগসাধন করে জয়লাভের পথে নেতৃত্ব দিতে হবে। এরই উপর নির্ভর করে আমাদের সাফল্য- আমাদের দাবি পূরণ।"

১৯৫২-৫৩ সালে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ধর্মঘটের যে জোয়ার দেখা গেল তার থেকে আমাদের শিক্ষণীয় এই যে ১৯৪৮ সাল থেকে মালিকশ্রেণী ও সরকারের যে মিলিত আক্রমণ শুরু হয় তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তদানীন্তন নেতৃত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন নি। তাঁরা কেবল নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করেই এই আন্দোলনের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। অথচ ঐ সময় ঐক্যই ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। তাই ১৯৫২ সালের আগে পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নি।

মনে রাখতে হবে, ঠিক ঐ সময়েই বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনও তাদের মুখপত্রে মাসের পর মাস শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আসছিল।

২

ঐতিহাসিক ধর্মঘট ও অতুলনীয় পদযাত্রা

১৯৫৩-৫৪ সালে, বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে যে কয়টি ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট ছিল রাণীগঞ্জ রিফ্র্যাক্টরী অ্যাণ্ড সিরামিক কারখানার শ্রমিকদের ৮ মাস ব্যাপী ধর্মঘট। এই ধর্মঘট ছিল সারা ভারতের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপতি স্যার বীরেন মুখার্জীর বার্ন সিরামিক কারখানায়। এই কারখানায় যারা কাজ করতেন তাদের কাজ করতে হোত সিলিকা, ম্যাগনেসাইট এবং প্রচুর ধূলা বালির মধ্যে, ফলে প্রতি বছরই এদের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ শ্রমিক যক্ষা রোগে আক্রান্ত হতেন। এদের চিকিৎসারও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। শ্রমিকদের ইউনিয়ন অনেক আন্দোলনের পর ৬ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সাল নাগাদ শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে এই রকম চুক্তি করতে মালিককে বাধ্য করে। কিন্তু ঐ চুক্তির ৬ বছরের মধ্যেও মালিক কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। ফলে বহু শ্রমিক চিকিৎসার অভাবে ইতিমধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প শ্রমিকদের ট্রাই ব্যুনালের রায় অনুযায়ী বেতন ও বোনাস বৃদ্ধি হয়। শ্রমিকদের ইউনিয়ন ঐ ট্রাইব্যুনালের রায় সিরামিক কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও কার্যকরী করা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা সংক্রান্ত চুক্তিও কার্যকরী করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু মালিকরা কোন দাবি মানতে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ইউনিয়ন ৩ মাসের ধর্মঘটের নোটিস দেয়। এর

প্রত্যুৎত্তরে কোম্পানী ইউনিয়নের সম্পাদক ও সহ সম্পাদককে কোনও কারণ না দেখিয়েই বরখাস্ত করে। ১৮ জন নেতৃস্থানীয় শ্রমিককেও সেই সঙ্গে ছাঁটাই করা হয়।

কোলকাতায় ডেপুটি লেবার কমিশনার এক ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন ডাকেন। তাঁর অনুরোধে ইউনিয়নের নেতারা ধর্মঘটের তারিখ আর এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেন। কিন্তু কারখানার মালিক স্যার বীরেন মুখার্জী কোন মীমাংসা করতে রাজী হলেন না। উপরন্তু আলোচনা চলাকালীন আরো ৩ জন শ্রমিককে সাসপেণ্ড করলেন এবং আরো অনেককে চার্জসীট দিলেন। এসব সত্ত্বেও ডেপুটি লেবার কমিশনার যখন ইউনিয়নকে অনুরোধ করলেন ধর্মঘটের তারিখ দু'দিন পিছিয়ে দেবার জন্য, যাতে তিনি মীমাংসার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তখনও ইউনিয়ন ডেপুটি লেবার কমিশনারের অনুরোধে ২৬ তারিখ থেকে পিছিয়ে ২৮শে এপ্রিল ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ২৮ তারিখ পর্যন্ত কিছুই হলনা—স্যার বীরেন মুখার্জী কোন মীমাংসায় আসতে কিছু মাত্র আগ্রহী ছিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন রাণীগঞ্জের ৩টি সিরামিক ফ্যাক্টরীর একটিকে বন্ধ করে জব্বলপুরে কারখানা খুলবেন, আর কিছু মাল ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করবেন। ইউনিয়ন স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়েছিল। রাণীগঞ্জের এই সিরামিক কারখানার ধর্মঘট ঐতিহাসিক ধর্মঘট হিসেবে পরিচিত হয়। তার প্রথম থেকেই ইউনিয়নের দূরদর্শিতা, নমনীয়তা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে একতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন তারা ধর্মঘটের তারিখ পর পর তিনবার পরিবর্তন করেন ডেপুটি লেবার কমিশনারের অনুরোধে। মনে রাখা দরকার ধর্মঘটের মুখোমুখি এসে তারিখ পরিবর্তন করা খুব সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। এতে প্রাথমিক অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরই সঙ্গে সঙ্গে

ইউনিয়নের নেতৃত্বেরও একটা ধৈর্য্যের এবং রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরীক্ষা হয়। শ্রমিকরা অবশ্য পরবর্তী কালে ধর্মঘটের দীর্ঘস্থায়ীত্ব দেখে বুঝতে পারে¬ যে নেতৃত্ব কেন লেবার কমিশনারের অনুরোধে বার বার ধর্মঘটের দিন পেছিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪৭ সালে বাসন্তী কটন মিলের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের পূর্বমুহূর্তে। সেই ধর্মঘটটিও ছিল ঐতিহাসিক। ধর্মঘট শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১২ই জুন, আর তার অবসান হয় ২০শে নভেম্বর। অর্থাৎ ধর্মঘট শুরু হোল স্বাধীনতার পূর্বে এবং শেষ হোল স্বাধীনতা লাভের পরে। ধর্মঘট শুরু হওয়ার পূর্বে কয়েকবার ধর্মঘট স্থগিত রাখা হয লেবার দপ্তরের অনুরোধে এবং শেষ বার নেতৃত্বের অনুরোধে। সেবারও শ্রমিকরা দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বার বার স্থগিত রাখা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি।

বাসন্তী কটন মিল এবং রাণীগঞ্জের সিরামিক শ্রমিকদের একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেটি হোল ইউনিয়নের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা। শুধু মাত্র দীর্ঘ-স্থায়ীত্বের দিক থেকেই নয়, বাসন্তী কটন মিলের মালিকের মতই বার্ন কোম্পানীর মালিকরাও ধর্মঘটের পূর্বে একটি দীর্ঘ সময় যাবৎ ইউনিয়নের মীমাংসার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। বার্ন কোম্পানীর মালিক আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে একের পর এক শ্রমিক নেতাদের ছাঁটাই করতে শুরু করে এবং শ্রমিকদের প্রায় জোর করেই ধর্মঘটের মুখে ঠেলে দেয়। এই চরম প্ররোচনার মুখে দাঁড়িয়েও শ্রমিকরা ইউনিয়নের বারংবার ধর্মঘট পিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ মেনে নেয়। এতে একদিকে যেমন শ্রমিকদের ইউনিয়নের উপর পরিপূর্ণ আস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, অন্য দিকে ইউনিয়নের নেতৃত্বের ধৈর্য, সহনশীলতা, শ্রমিকদের ওপর অটুট বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মঘটের পূর্বমুহূর্তেও ত্রিদলীয়

বৈঠক চলাকালীনই মালিক আরো শ্রমিক ছাঁটাই করে। তা সত্ত্বেও যখন লেবার কমিশনার ধর্মঘটের দুদিন আগে ধর্মঘট আরো দু'দিন পিছিয়ে দিতে বলেন ইউনিয়ন তাতেও রাজী হয়। লেবার দপ্তরের অনুরোধ অনুযায়ী ২৮শে এপ্রিল ১৯৫৪ ধর্মঘটের দিন ধার্য হয়। সেইদিনই সকালে অর্থাৎ ২৮শে এপ্রিল তারিখ লেবার কমিশনার ইউনিয়নকে অনুরোধ করেন আরো কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার জন্যে, কারণ শ্রমমন্ত্রী নিজে একবার স্যার বীরেন মুখার্জীকে বলে দেখবেন যদি কোন মিটমাট করা যায়। তাতেও ইউনিয়ন রাজী হয়।

ইউনিয়ন ১৯৫২-৫৩ সাল থেকেই একটা মিটমাটের চেষ্টা করে আসছিল। ঐ ২৮শে এপ্রিল শেষ পর্যন্ত ডেপুটি লেবার কমিশনার ইউনিয়নকে জানিয়ে দেন যে শ্রমমন্ত্রীর অনুরোধ রাখতে স্যার বীরেন মুখার্জী অস্বীকার করেছে, কাজেই অবশেষে মীমাংসার আর কোন সম্ভাবনাও রইল না। সেদিনই অর্থাৎ ২৮শে এপ্রিল বার্ন কোম্পানীর শ্রমিকরা বিকেল চারটে থেকে এক দীর্ঘস্থায়ী অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের পথে পা বাড়ান। অনির্দিষ্ট বলা হয়েছিল এই জন্যই কারণ স্যার বীরেন একে তো ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে অন্যতম—তার প্রভাব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ছিল অপরিসীম। স্যার বীরেন ধর্মঘটের পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেন তিনটি সিরামিক কারখানার একটিকে একদম বন্ধ করে দেবেন, আর জব্বলপুরে যেখানে সস্তায় মজুর পাওয়া যায় সেখানে একটি কারখানা তৈরী করবেন। আর সেখানে যা তৈরী হবে না সেগুলো বিলেত থেকে আমদানি করবেন। রাণীগঞ্জের এই আড়াই হাজার শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল বহু ছোট ছোট দোকান (মুদীর দোকান, স্টেশানারি দোকান, পান-বিড়ির দোকান) প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তাদের ক্রেতা ধর্মঘটী শ্রমিকদের হাতে কোন পয়সা ছিল না। বিড়ি কারিগরদের অবস্থা ছিল আরো খারাপ—

তারাও বেকারে পরিণত হল। সমস্ত রাণীগঞ্জের অবস্থাটা হয়ে উঠল থমথমে। ধর্মঘট ৮ মাস চলার পর ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নেয় যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের একটা অংশকে নিয়ে পায়ে হেঁটে এসে কলকাতায় মার্টিন বার্ন কোম্পানীর অফিসের সামনে ধর্ণা দেওয়া হবে। ২০শে নভেম্বর সকাল বেলা পথ চলা শুরু হয়, এই পথ চলা শেষ হয় ২রা ডিসেম্বর কলকাতার মার্টিন বার্ন কোম্পানীর সামনে এসে। এই ১১ দিন অভুক্ত, অর্ধভুক্ত জীর্ণ-শীর্ণ শ্রমিকরা ৮ মাস ধর্মঘটের পর ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করেন। সেইদিক থেকে এই পদযাত্রা অবশ্যই ছিল ঐতিহাসিক, যার সঙ্গে আজও অন্য কোন পদযাত্রার তুলনা হয় না। এই এগার দিনের পথ চলার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কবি ও সাহিত্যিক গোলাম কুদ্দুস, তাঁর অমর কাহিনী **'একসঙ্গে'** বইটিতে।

এই বইটিতে এই চলার হাসি-কান্নার কাহিনী ছাড়াও যেটা সবচেয়ে বড় করে ফুটে উঠেছে সেটা হোল এই দীর্ঘ পথ চলার সময় পথে পথে হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মানুষের অফুরন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা ও সহমর্মিতা, ধর্মঘটীদের প্রতি সমর্থনের, আর স্যার বীরেনের প্রতি ঘৃণার অভিপ্রকাশ। এই পদযাত্রায় ধর্মঘটী মানুষের ঐক্যই ছিল সবচেয়ে বড় সম্পদ।

১৯৫৪ সালে এই রাজ্যে আরও বড় বড় সংগ্রাম হয়েছে। সেই সব সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষকরা। তাদের উপর লাঠি চালিয়েছে বিধান রায়ের পুলিশ, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাদের জয়ও হয়েছে। কিন্তু রাণীগঞ্জ সিরামিক কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট ও পদযাত্রার সঙ্গে ঐ সময়কালীন অন্য কোন ধর্মঘটের তুলনা হয় না।

রাণীগঞ্জের এই ধর্মঘটও পুরোপুরি সফল হয়নি, যেমন হয়নি ১৯৩৮ সালে রাণীগঞ্জ পেপার মিলের ধর্মঘট—যে ধর্মঘটে পিকেটিং করতে গিয়ে কমরেড সুকুমার শহীদ হন। সুকুমারের বুকের উপর

দিয়ে সেদিন ইংরেজ অফিসার নিজে ট্রাক চালিয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাণীগঞ্জেরই শ্রমিকরা আবার ১৫ বছর পর শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন—শুধু পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে নয়, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের ঐক্যের এক নতুন উৎস খুলে দিয়ে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন রাণীগঞ্জে সিরামিক কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হারাধন রায়। ইউনিয়নের সঙ্গে একটা মীমাংসা মারফৎ এই ধর্মঘটের অবসানের পর শ্রমিকরা নিজেদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে ইউনিয়নের বাড়ি নিজেরা তুলে দিলেন তাই নয়, এই সিরামিক কারখানায় কাজ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ শ্রমিক যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়, সেই রোগের চিকিৎসার জন্য ইউনিয়ন অফিসের এলাকার মধ্যেই একটি এক্সরে প্ল্যান্ট সহ ডিসপেনসারি খোলা হয়। এই ডিস্‌পেনসারিটি হওয়ায় রাণীগঞ্জের সমস্ত গরীব মানুষের কাছে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার একটা বিরাট উপায় সৃষ্টি হয়। এই ডিস্‌পেনসারিতে প্রতিদিন একটি ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার রোগীদের দেখাশুনা করত। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে একদিন যক্ষ্মা রোগ বিশেষজ্ঞ লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জে গিয়ে রুগীদের পরীক্ষা করে আসতেন।

রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতা, সিরামিক শ্রমিকদের সাত মাসের ওপর ধর্মঘট করার পর যে ঐতিহাসিক পদযাত্রার কথা আমরা বলেছি, সেই সম্পর্কে আর একটু বিস্তৃত বিবরণ না দিলে তখনকার শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনা, তাদের মানসিকতা ও উদ্বেগ এবং কিভাবে আশে পাশের অন্যান্য শিল্পাঞ্চল থেকে মানুষ এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, কি ভাবেই বা ইউনিয়ন ধর্মঘটীদের সাহায্যর ব্যবস্থা চালিয়ে গিয়েছেন, কি ভাবে সমগ্র পদযাত্রায় হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে, কি ভাবে পদযাত্রীদের রণীগঞ্জের বীর শ্রমিক

বলে অভিহিত করেছিলেন, এগুলো সবই অপ্রকাশিত থেকে যাবে ফলে এই পদযাত্রার সম্পূর্ণ তাৎপর্য এবং এর সঙ্গে শ্রমিক সম্পর্ক কি তা বোঝা সংক্ষিপ্ত বিবরণে সম্ভব হয় না।

সিরামিক কারখানার আড়াই হাজার শ্রমিকদের মধ্যে মেয়ে শ্রমিক ছিলেন প্রায় এক হাজার। এই মেয়ে শ্রমিকদের মনোবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। এর মধ্যে দুটি মেয়ে একটি পুকুরের জল নিষ্কাষনে নালা খোঁড়ার কাজে লেগেছিল। কিছুটা নালা করার পর, ওর ভেতরে তাদের দুজনেরই চাপা পড়ে মৃত্যু হয়—তাদের নাম ছিল মাকী আর মেজারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য মেয়েরা মনোবল হারিয়ে ফেলেনি ; ইউনিয়নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং মালিকের প্রতি ঘৃণা এত গভীর ছিল যে কোন দুঃখ কষ্টই এদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। কবি এবং সাহিত্যিক গোলাম কুদ্দুস এদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটি মেয়ের কথা লিখেছেন—হিন্দি ভাষাভাষী মেয়ে সীতা তার গলার হাঁসুলি, হাতের চুড়ি ও পায়ের মল খুলে স্বামীকে দিয়ে বেচে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত গাইগরুটাও বেচতে হয়েছিল, কিন্তু তার মুখের হাসি কখনও ম্লান হয়নি। গোলাম কুদ্দুস তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"এ অবস্থার মধ্যেও তুমি এতো হাসছ কি করে ?" সীতা হাসতে হাসতে উত্তর দিল, "হাম কিসিকো পাস রোনে নেহি জায়েগা, যব তক্ রহেগা তো হাসিসে রহেগা।" এই ছিল নারী শ্রমিকদের মনোবলের প্রতীক। নারী শ্রমিকরা কেউ অবশ্য ওই অভিযাত্রীদের সঙ্গে যাননি, তবে যেসব পুরুষ শ্রমিকরা অভিযাত্রীদের সঙ্গ দিয়েছিলেন তাদের ঘরের মহিলা শ্রমিকরা তাদের এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের জন্য কোন ভাবনা করার কোন কারণ নেই। তারা যেন তাদের জন্য কোন চিন্তা না করে, তাদের জন্য আছে ইউনিয়ন, আছেন ইউনিয়নের 'বাবুরা'।

যাত্রা শুরু হওয়ার পূর্বে বেঙ্গল পেপার মিল ও রাণীগঞ্জ

মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিকরা অভিযাত্রীদের আশ্বাস দেন যে তারা কারখানার গেটে পাহারাও দেবেন এবং তাদের ফেলে যাওয়া পরিবারগুলির ব্যবস্থা তাদের ইউনিয়ন থেকে নেওয়া হবে। শুধুমাত্র পেপার মিলের ইউনিয়ন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য ৬ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন। ধর্মঘট চলাকালীন সমগ্র অসানসোল রাণীগঞ্জের কয়লাখনি শ্রমিকরা যেখানে লাল ঝাণ্ডা তথা এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়ন ছিলো তারাও সবাই এগিয়ে এসেছিলেন এই ধর্মঘটীদের সাহায্যে।

এই পদযাত্রা পরিকল্পনার প্রথম থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে একদিকে উৎসাহ এবং অন্যদিকে উদ্বেগ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। সকলেই যাওয়ার জন্য ইউনিয়ন অফিসে নাম লেখাতে চাইছিল, কিন্তু ইউনিয়ন সব দিক বিবেচনা করে মাত্র নিরানব্বই জনকে নিতে রাজী হয়। এর মধ্যে ছিলেন ভীম মণ্ডল বলে একজন শ্রমিক, যার কিছুদিন পূর্বে ছেলে মারা যাওয়ার পর মাথাটা প্রায় খারাপই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও বাঁকুড়া গ্রামের থেকে ১৮ মাইল হেঁটে এসে অভিযাত্রী দলে যোগ দিলেন। এরা ছাড়াও কয়েকজন বেঙ্গল পেপার মিলের শ্রমিক, রাণীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিক, কয়লা খনির শ্রমিক নেতা এদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেন। এদের সঙ্গে কাঁচ কলের একজন শ্রমিক গিয়েছিলেন। আর ছিলেন একদা ট্রাম শ্রমিক নেতা ক্ষেতনারায়ণ মিশির, যিনি মিশিরজী নামে পরিচিত ছিলেন। পদযাত্রায় ছিলেন পেপার মিলের নেতা রবীন সেন, আর যিনি এ অমর কাহিনী লিখে গেছেন সেই গোলাম কুদ্দুস নিজে ছিলেন, এছাড়া সাধারণ সম্পাদক হারাধন রায়, সহ সম্পাদক উষা দাসগুপ্ত, কোলিয়ারী মজদুর সংগঠক সুনীল বসু রায় এবং আসানসোলের নেতা বিজয় পাল প্রভৃতি। শ্রমিকদের মধ্যে ছিল বাঁকুড়ার ভীম মণ্ডল। আর যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে গনেশ ভগতের মতো দু একজন মিথ্যা কথা বলে বাড়ী থেকে

বেরিয়েছিলেন। তাঁদের স্ত্রীরা তাঁদের যাবার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি ;—বরং মেয়েরা এদের সাহস জুগিয়েছে। এর মধ্যে ছিলো বঙ্কুনাথ, চারজন সর্দার—নারায়ণ, রামধুন, পরিমল ও ফাগু। এর মধ্যে রামধুনকে অনেকেই দালাল বলে জানতো। ফাগু সর্দার এই যাত্রার পূর্বে মদ খায়নি এই রকম একদিনও যাইনি। আগে তো কারখানার ভেতরেই মদের আড্ডা বসতো, ইউনিয়নের চেষ্টায় সেটা বন্ধ হয়েছিলো। ফাগু কিন্তু এই যাত্রা পথে মদ খাওয়া সম্ভব হবে না জেনেও কোন রকম দ্বিধা না করে এদের সঙ্গে ·রওনা হয়েছিল। আরও ছিলেন গোপাল দাস, শ্রীপথ প্রভৃতি।

অভিযাত্রীদল রাণীগঞ্জ থেকে বেরিয়ে যতই এগোতে থাকে তাঁদের অভ্যর্থনার বহরটা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্ধমান জেলার মূল শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুরে তখন ট্রেড ইউনিয়ন ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। তবুও সেখানে অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি। দুর্গাপুর থেকে পানাগড় পর্যন্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন আশেপাশের কৃষক সংগঠনগুলি। কয়লা খনির সংগঠক সুনীল বসু রায় দুর্গাপুর থেকে অভিযাত্রী দলের সঙ্গে হাঁটছিলেন। তিনি একদা পানাগড় অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। ধর্মঘটের সময় তাঁর চাকরি যায়। পানাগড়ের অর্ডিন্যান্স কারখানার শ্রমিকরা বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করেন। পানাগড় পার হয়ে বুদবুদের পথে চলতে আরো বহু শ্রমিক বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এসে অভ্যর্থনা জানায়। বুদবুদে একটি বেশ বড় রকমের সভায় অভিযাত্রীদের সম্বর্ধনা জানান হয়। সেখানে খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থাও খুব ভালো হয়েছিল। এই অভিযাত্রীদের সঙ্গে জ্যোতি বাউরি নামে এক প্রৌঢ় শ্রমিক ছিলেন। ১৯৩৮ সালেও এই সিরামিক কারখানার শ্রমিকরাই পদযাত্রা করে কলকাতায় এসেছিলেন মালিকের কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে। বুদবুদের অভ্যর্থনায় পদযাত্রী

শ্রমিকরা কিছুটা অভিভূত হয়েছিল। তাই তারা ১৯৩৮ সালের অভিজ্ঞতা শুনতে উদগ্রীব। জ্যোতি বাউরি এখানে তার '৩৮ সালের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বললেন "সেদিন আমাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি, আমাদের যাওয়ার খবরই কেউ জানত না। রাত কাটত আমাদের গাছতলায়। আর গাছের কদবেল ছিল প্রায় আমাদের একমাত্র আহার। একজন না খেতে পেয়ে মরেই গেলো পথের মধ্যে—তার নাম ছিলো গতি কোলে।" (একসঙ্গে পুস্তকের পৃষ্ঠা ৬০)।

এই পদযাত্রার সময়ও শ্রমিকদের মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিলো পথে কি হবে, খাওয়া পরার চিন্তার চেয়েও বেশী চিন্তা ছিল পুলিসের ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে। মালিকের পক্ষ থেকে ক্রমাগত ভয় দেখান হয়েছে কলকাতার পথে পথে পুলিস থাকবে, গুলি চালাবে, জেলে নিয়ে যাবে। কিন্তু যাত্রার পূর্বে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করে ঠিকই করে নিয়েছিলেন—অভিযাত্রীদের আগে আগে দু একজন সাইকেল আরোহীকে রাস্তা দেখে আসার জন্য পাঠান হবে। যদি রাস্তায় পুলিস আছে খবর পাওয়া যায়, তবে গ্রামে প্রবেশ করে, গ্রামের পথ ধরে গিয়ে পুলিসকে পাশ কাটিয়ে আবার বড় রাস্তায় উঠতে হবে। এ সত্ত্বেও যদি পুলিস কোনরকমে এদের সামনে এবং পেছনে ঘেরাও করে ফেলে, তবে সেখানেই রাস্তার ওপরে বসে পড়তে হবে। লাঠি চার্জ কিংবা গ্রেপ্তার করলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত এলাকাতে খবর ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করা যায়, এবং রানীগঞ্জ সিরামিক কারখানার সংগ্রামকে অন্যান্য কলে কারখানার শ্রমিকদের সংগ্রামে পরিণত করা যায়।

শক্তিগড়ের কৃষকরা তরিতরকারি, চাল-মুড়ি যার যা সাধ্য দিয়েছে। আর অভিযাত্রীদের জন্য ব্যবসায়ীরা দিয়েছে ডাল, তেল, মশলা। এক চালকলের মালিক অভিযাত্রীদের প্রয়োজনীয়

এক দিনের সমস্ত চাল দিয়েছে। এ সব দেখা সত্ত্বেও শ্রমিকদের চেতনার স্তর একেবারে সাধারণ ও প্রাথমিক ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে এ সবই হারাধন বাবুর বন্ধুরা ব্যবস্থা করছেন, এবং করছেন তাদের নিজেদের যশ ও সুনামের জন্য। এমন কি সাংবাদিক ও কবি গোলাম কুদ্দুসও যে তাদের তাদেব সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন সেটাও তাঁর নাম ও যশেব জন্য।

"এটা বারবারই দেখা গেছে যে যেসব জিনিষ আমাদের চোখে জলের মতো পরিষ্কার এবং যে সব জিনিস চোখের সামনে ঘটেছে সেসব ব্যাপার সম্পর্কে আমরা ভেবে বসি যে এটা সকলেই বুঝবে, কিন্তু তা বোঝে না। ধৈর্য সহকারে বুঝিয়ে দিতে হয়। জ্যোতি বাউরিব '৩৮ সালের পদযাত্রার অভিজ্ঞতা শোনার পরেও পথেব বিপুল অভ্যর্থনার তাৎপর্য এদের কাছে অস্পষ্ট ছিল।

"যে লোক রাণীগঞ্জের ধাওড়ায় কাটিয়ে এল সারা জীবন, না আছে শিক্ষা, না আছে নিজের গণ্ডির বাইরে কোন জিনিস সম্পর্কে চিন্তার ক্ষমতা, না আছে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক, জীবন যার পশুর মত, ইউনিয়ন আজো যাব বৃহত্তর কোন শিক্ষারই কোনও বন্দোবস্ত করতে পারেনি, সে কি করে বুঝবে শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের কি মানে, কৃষকসভা কি বস্তু, কেন এসবের জন্ম, কারা এসব চালায়, কেমন করে চলে, কী করে যোগাযোগ রাখে, প্রভৃতি হাজারো প্রশ্নের মানে। পর চলার খবর দেশের লোকের মধ্যে প্রচার করে স্বাধীনতা পত্রিকা কী ভাবে সেই পথ চলাকে সুগম করে তুলেছে তাই বা কিভাবে বুঝবে। কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বোঝা তো অনেক দূরের কথা। তাই অভ্যর্থনার আয়োজন চোখের সামনে দেখছে, বিচলিত হচ্ছে, শক্তি পাচ্ছে, সাহস পাচ্ছে, অস্পষ্টভাবে কিছু ভাবছে, কিছু শিখছেও, কিন্তু তবু বুঝতে পারছে না এখনো। ওরা ইউনিয়ন সম্পাদক হারাধন রায়ের সাহস, ত্যাগ

সংগঠন শক্তি দেখেছে, নিজেদের সমস্ত মঙ্গলকর ব্যাপারের মূলেই তাঁর যাদুকরী শক্তি খুঁজতে চেষ্টা করে। এরা কেউ বোকাও নয়, হাবাও নয, অনেকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। সাহস এবং বীরত্বের অধিকারী প্রায সকলেই। কিন্তু এদের আরো সমাজ চেতনা চাই, শিক্ষা চাই, অভিজ্ঞতা চাই।"

(গোলাম কুদ্দুস রচিত 'একসঙ্গে' পুস্তকটি হইতে—৯০ পৃঃ)

এই ছিল তখনকাব দিনেব সেই সব শ্রমিকদের চেতনার স্তর। সেইদিন থেকেই অর্থাৎ বুদবুদের রাত্রিবাস থেকেই মিশিরজী প্রতিদিনই অভিযাত্রীদের বোঝাতে আবম্ভ করেন—তাদেব পার্শ্ববর্তী এলাকায যেমন বেঙ্গল পেপার মিলের শ্রমিকরা হাজার হাজার টাকা তুলেছেন, যেমন মিউনিসিপ্যালিটিব শ্রমিকরা তাদের পরিবারগুলি দেখা শোনাব প্রতিশ্রুতি দিযেছেন—যেমন আসানসোলের কযলাখনিব শ্রমিকদের ইউনিযনের নেতারা তাদেব পদযাত্রার সাথী হযেছেন—তাদের প্রতি সহমর্মিতার জন্য, ঠিক সেই রকমই রাণীগঞ্জ থেকে বুদবুদ আসার পথে যেসমস্ত কল-কারখানা পড়েছে সেই সব কলকারখানার শ্রমিকদের ইউনিযনগুলিও অনুরূপ ভাবে তাদের সহমর্মিতা ও সমর্থন জানাবার জন্য তাদের সাধ্য মতো সাহায্য নিযে এগিযে এসেছে। শ্রমিকদেব কেন্দ্রীয সংগঠনের নাম যেমন সারা ভারত ট্রেড ইউনিযন কংগ্রেস, তেমনই কৃষকদেরও একটা সংগঠন আছে তার নাম কৃষক সভা। সেই কৃষক সভার ডাকেই দলে দলে কৃষকরা এগিযে এসেছেন রাণীগঞ্জের এই পদযাত্রীদের সাহায্যে। এই কথাগুলো তারা অবশ্য একদিনে বোঝেনি, কিন্তু এই পদযাত্রীরা যখন হুগলীর শিল্পাঞ্চলে প্রবেশ করে তখন থেকে তারা উপলব্ধি করতে সুরু করে যে শ্রমিকরা যেখানেই-কলে কারখানা বা খনিতে কাজ করুন না কেন, তারা সবাই ভাই ভাই এবং তারা সবাই মিলেই একটা শ্রেণী। বালি খালের এপারে আসার পর হাওড়া জেলায় কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী

এসে এক সভায় অভিযাত্রীদের সম্বর্ধনা জানিয়ে বক্তৃতা দেন। এই পদযাত্রার শেষ পর্যায়ে এসে ওই বঙ্কুনাথ, ভীম মণ্ডল, গৌরীশঙ্কর, গণেশ ভক্ত প্রভৃতির মুখ দিয়ে বেরোয় যে তাদের সংগ্রাম শুধু স্যার বীরেনের বিরুদ্ধে নয়, সরকারের বিরুদ্ধেও। কারণ সরকার যদি না চাইতো তবে স্যার বীরেন এই রকম করতে পারতো না। সমস্ত পথে হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক তাদের সংগ্রামের পথে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, নিজেদের আর্থিক দূরবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য যে সাহায্য করেছেন, তা শুধু স্যার বীরেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নয়, এটা তাদের সকলের সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধেরই একটি প্রকাশ। এই অভিযাত্রীরা এটা বুঝতে পেরেছিল যে লাল ঝাণ্ডা তাদের শ্রমিক কৃষক সকলকে একত্রিত করতে পেরেছে। লাল ঝাণ্ডা না থাকলে এতসব সম্ভব হ'ত না। কলকাতা মহানগরীতে পৌঁছবার পর সারাদিন মাটিন বার্ন কোম্পানীর অফিসের সামনে ফুটপাথের ওপর অভিযাত্রীরা যখন বসে ছিল, তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল হাজার হাজার কল কারখানার শ্রমিকরা আর ডালহাউসি স্কোয়ার-এর কর্মচারীরা। তারা ফল, মিষ্টি, টাকা অকাতরে শ্রমিকদের হাতে তুলে দেয়। শেষ পর্যন্ত এদের হয়তো জয় হোলনা, এর জন্য তাদের লজ্জার শেষ ছিল না। এরা ভাবছিল রাণীগঞ্জে গিয়ে তারা আর সব শ্রমিকদের কি বলবে, আর যারা তাদের এতো করল রাস্তায় তাদেরই বা কি বলবে। এটা তারা বুঝেছিল বৃদ্ধ পরিমল সর্দারের ভাষায়—"হিয়াঁ পর জুলুম হ্যায়, রাণীগঞ্জ মে জুলুম হ্যায়, সারা দেশ যে জুলুম হ্যায়, সব জুলুম কা খেলাপ এক হোনা চাহিয়ে।" এরা বুঝেছিলেন, পথে পথে এরা মিলতে মিলতে চলেছিলেন কৃষকের সঙ্গে, ছাত্রের সঙ্গে, উদ্বাস্তুর সঙ্গে, মধ্যবিত্তের সঙ্গে—এই সব মানুষের বুকে দুঃখ না থাকলে এই মিলন সম্ভব হ'ত না। সকলের সমস্যা সকলকে এক গ্রন্থিতে বেঁধে দিয়েছে।

এটাই হোল ঐক্যের প্রকৃষ্টতম অভিব্যক্তি। এই ঐক্যই গড়ে উঠেছিল রাণীগঞ্জের বুভুক্ষু ধর্মঘটী বীর শ্রমিকদের দেড়শ' মাইল পদযাত্রার মধ্য দিয়ে।

৬

দলমত নির্বিশেষে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

১৯৫৩-৫৪ সালে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঢেউ এসেছিল তার মধ্যে শিক্ষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছিল অন্যতম। ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হতে কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষকরা লাগাতার ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হন। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল—

১। ৩৫ টাকা হারে মহার্ঘভাতা।

২। মাধ্যমিক শিক্ষক পর্ষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে বেতন বৃদ্ধি।

৩। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ে শতকরা ২০ ভাগ বরাদ্দ।

৪। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার ও পরিবর্তন।

এবং

৫। সরকার কর্তৃক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি।

যুদ্ধের সময়কাল হতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরাই মহার্ঘভাতা পেতেন। তার কারণ ঐ সময়কালে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পায়।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন ঐ সময় যেমন খুবই কম ছিল, অন্যদিকে সরকার মাত্র পাঁচ টাকা করে মহার্ঘভাতা দিতেন। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সরকার মহার্ঘভাতা পাঁচ টাকা হতে বাড়িয়ে দশ টাকা হারে ধার্য করলেন।

১৯৪৮ সালের পর সরকার শিক্ষকদের বেতনের হার নির্দিষ্ট করে দেন। আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বেতনের হার ধার্য

হয়েছিল ৫০-৩-৮০ টাকা পর্যন্ত। গ্রাজুয়েটদের বেতন আরম্ভ ৬০ টাকায়, আর বি. টি. পাশ শিক্ষকদের ৭৫ টাকা থেকে ১০ টাকা হারে বাড়িয়ে ১৫০ টাকায় শেষ। তাও ১২০ টাকার পর বেতন বৃদ্ধি প্রধান শিক্ষকদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পাশ হলে তাদের প্রাথমিক বেতন ছিল ৯০ টাকা। এর সঙ্গে মহার্ঘভাতার কথা আগেই বলেছি—'৫৩ সাল হতে ১০ টাকা মাত্র।

বলা বাহুল্য যে এই বেতনের হার তদানীন্তন যেকোনও সংগঠিত শিল্পের তুলনায় অথবা সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় অনেক কম ছিল।

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য তদানীন্তন রাজ্য সরকার শিক্ষাখাতে বাজেটের মাত্র ৭ ভাগ ব্যয় করতেন। আর এটা ছিল ভারতবর্ষের যে:কোন রাজ্যের তুলনায় কম। মহীশূরে ছিল বাজেটের ২২ ভাগ, আর বোম্বাইতে ছিল শতকরা ২১ ভাগ। [এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার আসার পর শিক্ষাখাতে বাজেটের ২৩ ভাগ ব্যয় করা হয়। আর সেখানে ভারত সরকারের বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ ২ ভাগ মাত্র]।

এই অবস্থায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ন্যূনতম দাবি ছিল মূল বেতন ২০০ টাকা। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষক পর্ষদ এর চেয়ে অনেক কম হারে বেতন নির্ধারিত করে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সমস্ত শিক্ষকসমূহের ঐ:ক্যের প্রতি নজর রেখে সে বেতন হার মেনে নিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু, সরকার ঐ বেতন হার চালু করার পরিবর্তে শিক্ষকদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং প্রধান শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আলাদা করে চুক্তি করবার প্রচেষ্টা চালায়, যাতে প্রধান শিক্ষকদের সাথে সাধারণ শিক্ষকদের ঐক্য না থাকে, যাতে প্রধান শিক্ষক:দের দিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়। এখানে কংগ্রেস সমর্থিত শিক্ষক

এবং সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও চালান হয়।

কিন্তু ফল হয় ঠিক উলটো, পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি সর্বস্তরের মানুষের সেদিন ব্যাপক সমর্থন-লাভ করেছিল। কংগ্রেস ব্যতীত রাজ্যের অন্য সব রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। এমনকি সংবাদপত্রগুলিও দাবিগুলির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করে তাঁদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। আই এন টি ইউ সি ব্যতীত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, কৃষকসভা, ছাত্র-যুব-মহিলারা শিক্ষকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতিতে শিক্ষকদের এই সব দাবিগুলির প্রতি সমর্থন করে বিভিন্ন গণসংগঠন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ফলে শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে রাজ্যব্যাপী এক ব্যাপক মোর্চা গড়ে ওঠে।

ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটের সমর্থনে জনগণের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা

১৯৪৮-৫১ সালে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে বিভেদের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তারপর শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণী তথা জনগণের এতবড় ঐক্যবদ্ধ মোর্চ্চা এই প্রথম গড়ে উঠল।

১৯৫৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী কোলকাতার মনুমেণ্ট (শহীদমিনার) ময়দানে এক বিশাল জমায়েতে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন, কর্মচারী সংগঠনসমূহ, বিভিন্ন ছাত্রসংঘ ও রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ হতে শিক্ষকদের আসন্ন সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জানানো হয়। সেই বিশাল সমাবেশ থেকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় —আমরা স্বভাবশান্ত শিক্ষকসমাজের সঙ্গে আপোস মীমাংসার পক্ষপাতী, কিন্তু আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ঐ নিরীহ, শান্তিপ্রিয় শিক্ষকদের প্রতি যদি

নির্যাতন হয়, যদি কোন কারণে তাঁদের রক্তপাত ঘটে তবে পশ্চিম-বাংলার মানুষ সেই অপরাধ কখনোই ক্ষমা করবে না।

পূর্ব নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ সাল পশ্চিমবাংলায় সমস্ত গ্রামে-শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন। তদনীন্তন কংগ্রেস সরকারের সব রকম বিভেদ প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষকরা ধর্মঘটে যোগদান করেন। সেই সময় পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। এখন ১ লক্ষ ৩০ হাজার। একমাত্র কোলকাতায় ১৬০টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩০টি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র কয়েকটি সরকারী ও মিশনারী স্কুলে ক্লাস হয়। সেখানেও ছাত্রদের উপস্থিতি খুবই কম ছিল।

বহু কলেজের ছাত্ররাও সেদিন ক্লাসে যোগদান করেননি। হাওড়া, হুগলী দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া, কালনা, কাটোয়া, বর্ধমান, আসানসোল, তমলুক, রাইনা, সিউড়ী প্রভৃতি সমস্ত জেলা ও মহকুমা শহর ও গ্রামগঞ্জের মাধ্যমিক শিক্ষকরা ধর্মঘটে হাজারে হাজারে যোগদান করেন।

কোলকাতার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে যেমন—দমদম, বেহালা, কাশীপুর, মহেশতলা, বজবজ, নৈহাটী, ভাটপাড়া, বেলঘরিয়া, বরাহনগর, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত স্কুলের শিক্ষকরা ধর্মঘটে শামিল হন।

স্কুল বোর্ডের বেতন সুপারিশ কার্যকরী করা, সকল শিক্ষকের জন্য ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা ও বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য ধার্য করার দাবিতে ১১ই ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটী শিক্ষকরা মিছিল করে তাদের দাবি পেশ করবার জন্য রাইটারস্ বিল্ডিং অভিমুখে যাবার সময় পুলিশ বাধা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তায় অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী হাজার হাজার ধর্মঘটী শিক্ষকরা মিছিল করে রাইটারস্ বিল্ডিং অভিমুখে যাত্রার পথে এসপ্ল্যানেড-ইস্টে পুলিশ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়ে সেখানে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁদের প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য বিভিন্ন ইউনিয়ন ও কর্মচারী সমিতি, বাস্তুহারা সমিতি প্রভৃতি অবস্থানরত শিক্ষকদের সম্মুখে এসে তাঁদের প্রতি সমর্থন জানান। ১২ই ফেব্রুয়ারী গ্রামেগঞ্জে হরতালের আহ্বান জানান হয়। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী তথা জনগণের সমর্থনপুষ্ট শিক্ষকদের আন্দোলন ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলে।

১১-১৫ ফেব্রুয়ারী এই পাঁচদিন-প্রতিদিনই হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মিছিল করে অবস্থানরত শিক্ষকদের সমর্থন জানাতে আসেন। শত শত শ্রমিক ইউনিয়ন, কর্মচারী সমিতি, ছাত্র ও ছোট ব্যবসায়ীরা প্রচুর খাদ্য ও অর্থ দিয়ে শিক্ষকদের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। অবস্থানরত শিক্ষকদের রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য মাথার উপর চটের পর্দা টাঙ্গিয়ে দেন। বলা চলে যে ঐ কয়দিন ধর্মঘটী শিক্ষকদের অবস্থানের জায়গাটা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই পাঁচদিনে একথা প্রমাণিত হয়—একদিকে বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভা ও তার গুটি কতক সমর্থক ধর্মঘট ভাঙ্গার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, আর অন্যদিকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এই অবস্থায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত ২-১৫ মিনিটে হঠাৎ পুলিস এসে তদানীন্তন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সত্যপ্রিয় রায়, অন্যতম নেত্রী অনিলা দেবী ও শৈলেন ব্যানার্জীসহ ২০৫ জন শিক্ষক ও ২০ জন শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করে রাখে। তাঁদের বিরুদ্ধে রাস্তায় চলাচলের বাধা সৃষ্টি করার মামলা রুজু করা হয়।

এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঐ সময়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসী সমস্ত রকম মতামতের সাধারণ

শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এর সভ্য বা সভ্যা ছিলেন এবং তাঁরা সবাই এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। এই ঐক্য ছিল সেদিনকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে তীব্র গণবিক্ষোভ ও পুলিশের নৃশংস আক্রমণ

১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্য রাত্রে ধর্মঘটী শিক্ষক ও নেতৃত্বকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে এবং গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঐ দিন কলকাতা ময়দানে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী, সর্বস্তরের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র-যুব-মহিলারা সমবেত হয়ে বিধানসভা অভিমুখে শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পুলিস প্রথমে কম্ অম্বিকা চক্রবর্তী, এম এল এ, কম্ সুবোধ ব্যানার্জী, এম এল এ, কম্ দাসরথী তা, এম এল এ, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে শোভাযাত্রার পুরোভাগ থেকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে বিধানসভা ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে পাঁচ শতাধিক পুলিশ লাঠি, রাইফেল, টিয়ার গ্যাস সহ শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মম আক্রমণ চালায়। রাণী ভবানী স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র রবীন্দ্রনাথ সরকার ও যাদবপুরের ৬৩ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ শিক্ষককে নৃশংসভাবে লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। পুলিশের এই উন্মত্ত আচরণে জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। নিউ মার্কেটের সামনে নারায়ণ স্বামী নামে এক ভদ্রলোককে এক পুলিশ সার্জেণ্ট ডেকে এনে গুলি করে হত্যা করে। গণবিক্ষোভে পুলিশ কিছুক্ষণের জন্য পিছু হটে এবং এসপ্লানেড ও চৌরঙ্গী অঞ্চলে ঢুকতে সাহস করেনি। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে এসপ্লানেড ও ওয়েলিংটন থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত এবং দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বালিগঞ্জ পর্যন্ত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে ওঠে ব্যারিকেড

আর অলিতে গলিতে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল। রাত ৮টায় ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে সি. কে. ব্রাদার্স এ্যাসোসিয়েশনের বোর্ডিং-এর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক ইয়াসিং নামক এক ভদ্রলোককে পুলিশ তাক করে গুলি ছোঁড়ে। হাসপাতালে যাবার পথে এই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। ভবানী দত্ত লেনে এক বাড়ির দোতালায় শ্রীমতী প্রভা দেবীকে পুলিশ তাক করে গুলি ছোঁড়ে। গুলি মহিলার পায়ে লাগে। পুলিশ শ্রীমানী মার্কেটে ঢুকে বেপরোয়া গুলি চালায়। এখানে গুলিতে মন্মথ বর্মন নামে এক কাঁসারী শ্রমিক নিহত হয়। অজিত কুমার দে নামে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসের এক কর্মচারী বাজার করে ফেরার পথে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। স্টেটস্‌ম্যান অফিসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ৪ জন পিওন ও একজন ড্রাইভার পুলিশের গুলিতে আহত হয়। কর্পোরেশন অফিসের ভিতর গুলি চালাবার ফলে ৫ জন কর্মচারী আহত হয়। মুচিপাড়া, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণোওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে পুলিশ গুলি চালায়। ২৪৯ বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটে বি. পি. টি. ইউ. সি অফিস ও ট্রামের ইউনিয়ন অফিস থেকে মনোরঞ্জন রায়, মহম্মদ ইসমাইল ও অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রাত প্রায় ৩টায় সরকার মিলিটারী রাস্তায় নামায। গভীর রাতে মিলিটারী ও পুলিশ যৌথ ভাবে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলগুলিতে ঢুকে তছনছ করে। বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় লালবাজার কণ্ট্রোল রুমে বসে পুলিশ মিলিটারীর অ্যাকশন পরিচালনা করেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ শহরতলীতে ১৪৪ ধারা জারি করে। সে দিন রাস্তায় কোন স্টেটবাস ও ট্রাম বের হয়নি। সারাদিন শহরে পুলিশ ও মিলিটারী রাইফেল উঁচিয়ে টহল দিয়ে বেড়িয়েছে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক ছাত্র সভার পরে শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে বিরাট ছাত্রমিছিল বের হয়। ডালহৌসির প্রায় ১০ হাজার কর্মচারীর এক দৃপ্ত মিছিল পুলিশ স্ট্রাণ্ড রোডে আটক করে। বিকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম কমিটি এক সভা আহ্বান করেছিল। সভার বহু পূর্ব থেকে মিলিটারী পার্ক দখল করে রাখে। পৌনে ৫ টায় ৭ জন শিক্ষক পার্কের চারপাশে হাজার হাজার লোকের শ্লোগানের মধ্যে সভা করবার জন্য পার্কে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার হন। পুনরায় আরও ৭ জন গ্রেপ্তার হন। সন্ধ্যার সাথে সাথে মিলিটারী রাইফেল উঁচিয়ে সমবেত জনতাকে তাড়া করে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এক দল লোক শ্রমমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে সমবেত হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ গুলি চালায়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ সারাদিন কম্‌ মোহিত মৈত্র ও সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী সহ ১৬০ জনকে গ্রেপ্তার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ জনেরও বেশী অধ্যাপক ধৃত শিক্ষকদের বিনাসর্তে মুক্তির দাবিতে এক বিবৃতি প্রচার করেন এবং তদানীন্তন বি পি টি ইউ সি শিক্ষক ও জনগনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে এক বিবৃতি প্রচার করে। মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) পুলিশের গুলিতে আহত শ্রীসুশীল বসু (ডাঃ সহায় রাম বসুর পুত্র) হাসপাতালে মারা যান। বুধবার (১৭ই) পর্যন্ত নিহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ জন।

৭টি অমূল্য জীবন নষ্ট এবং ৫৭ জন গুরতরভাবে আহত হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় বিধান সভায় শিক্ষকদের দাবি সম্পর্কে এক নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব হলো সরকার শিক্ষকদের ১৭ টাকা মহার্ঘভাতা দিতে প্রস্তুত আছে এবং তা এখন থেকেই কার্যকরী করা হবে। স্কুলে ১৭ টাকা দিলে সরকারও ১৭ টাকা দেবে এই সর্ত তুলে নেওয়া হচ্ছে। ৭৫০ জন ছাত্র আছে যেসব স্কুল সরকারী সাহায্য পায় না সেই সব স্কুলের

১১ হাজার শিক্ষককে পূর্ব ঘোষিত ৫ টাকার বদলে ১০ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হচ্ছে এবং ট্রেনিং গ্রহণে অযোগ্য বা অনিচ্ছুক শিক্ষকদের জন্য কিছু করা সম্ভব নয় বলে আগে যে ঘোষণা করা হয়েছিল, এরূপ ৪৩১২ জন শিক্ষককে ৫ টাকা করে দেওয়া হবে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবে কম্ জ্যোতি বসু বলেন যে প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিই একমাত্র মত দিতে পারে, সুতরাং বৈঠক বসাবার সুযোগ দেবার জন্য অবিলম্বে ধৃত শিক্ষকদের মুক্তি দেওযা হোক। ডাঃ বিধান রায় উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় বন্দী শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষিত হয। সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ঘোষণা করেন যে ধৃত শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে বিধান বায়ের প্রস্তাব বিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নিহত ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং পুলিশী অত্যাচারের তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এবং ভারতের বাইরে থেকে শিক্ষকদের সংগ্রামে সমর্থন জানান হয়। সংসদের উভয় কক্ষে বিরোধী সদস্যরা বিধান রায়ের শিক্ষক নিপীড়ন ও দমনমূলক নীতির তীব্র নিন্দা করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শিক্ষক আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে সভা ও মিছিল সংগঠিত হয়। সমস্ত অংশের মানুষ এই সভা ও মিছিল থেকে দাবি জানায়, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধৃত শিক্ষক সহ গণআন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে। শহীদ দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরার স্কুল কলেজে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। আগরতলায় এক ছাত্র সমাবেশে পুলিশ লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চালিয়ে ৬০ জন ছাত্র ছাত্রীকে আহত করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অংশের

মানুষের বিক্ষোভ আন্দোলনের ফলে ডাঃ বিধান রায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতির সাথে আলোচনার সময় ধৃত শিক্ষক ও অন্যান্যদের মুক্তি দিতে সম্মত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারী নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির সভায় সরকার কর্তৃক আংশিক দাবি পুরণের প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী আদালত থেকে ধৃত মোট ৩৯২ জনকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কম্ সত্যপ্রিয় রায, অনিলা দেবী, শৈলেন ব্যানার্জী সহ ৪৪ জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ১৬-২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মোট ৩৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ২৬ জনকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। এই বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মধ্যে ছিলেন প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মনোরঞ্জন রায, মহম্মদ ইসমাইল, নীরোদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, মনিকুন্তলা সেন, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিধান সভার সদস্যরা।

জেল থেকে মুক্তির পরে কম্ সত্যপ্রিয় রায প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এক কার্যকরী কমিটির সভায় মিলিত হয়ে পুলিশের গুলিতে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে একটি শহীদ তহবিল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার সহ শিক্ষক ও অন্যান্য গণ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানানো হয়।

আন্দোলনের পূর্বে এম এ/এম এস সি, বি এ/বি এস সি (অনার্স) বি টি শিক্ষকদের বেতন হার ছিল ৯০ টাকা এবং আন্দোলনের ফলে হলো ১২৫ টাকা। পাঁচ বছরের কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের বেতন ৯০ টাকা থেকে ১০৫ টাকা, বি এ বি টি, এম এ (তৃতীয় শ্রেণী) ও বি এ (অনার্স) শিক্ষকদের বেতন ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা, দশ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বি এ,

বি এস সি পাশ শিক্ষকদের ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। অন্যান্য অনুমোদিত শিক্ষকরা যারা ৫০ টাকা বেতন পেতেন তারা ৩ বছরের ট্রেনিং সাপেক্ষে ১০ টাকা ভাতা পাবেন।

শ্রমজীবী মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেছিল

সেদিনকার শিক্ষকদের আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রমিকশ্রেণী, কর্মচারী, ছাত্র ও অন্যান্য অংশের মানুষের সক্রিয় সমর্থন সহযোগিতায় আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছিল। সরকারের তীব্র দমন-পীড়নের মুখে গড়ে উঠেছিল শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ় ঐক্য। সেই দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ৭টি অমূল্য প্রাণ বিসর্জিত হয়েছিল এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শতাধিক মানুষ গুরুতর আহত হওয়ার পরে সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে মাত্র ২০ টাকা বেতন বৃদ্ধি ঘটেছিল। সেদিনের শিক্ষক আন্দোলন শুধু মাত্র পশ্চিমবাংলা নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের চিন্তা চেতনাকে যেমন উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল, অপর দিকে শিক্ষা ও শিক্ষক সমস্যাকে জাতীয় সমস্যার স্তরে উন্নীত করতেও সমর্থ হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণী সহ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ অসংখ্য আন্দোলনের তরঙ্গে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের ইমারত তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে। শত শত বীর শহীদের আত্মত্যাগে প্রতিক্রিয়ার শক্তি পিছু হটেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বামফ্রন্টের সরকার। এই সরকার সর্ব স্তরের শিক্ষকদের শুধু বেতন বৃদ্ধিই করে নি, তাদের সামাজিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে শুধু আবেদনের মধ্য দিয়েই আন্দোলনে ঐক্য গড়ে ওঠেনি। শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী

মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঐক্য গড়ে তুলেছিল। শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে বহু আন্দোলনের মধ্যে সেই ঐক্য আরও সংহত হয়েছিল। বিভিন্ন মত ও পথের শিক্ষকরা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যেই সংগঠিত ছিলেন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যখন শাসকশ্রেণী ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে তখনই তারা সেই আন্দোলনের সংগঠনকে বিভেদের পঙ্কে নিমজ্জিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠন থেকে তাদের অনুগামীদের সরিয়ে নেবারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯৪৭ সালে যেমন এ আই টি ইউ সি-তে ভাঙন এনে কংগ্রেস আই এন টি ইউ সি গড়ে তুলেছিল, পরবর্তী সময়ে তেমনই ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক সংগঠনেও ভাঙন ধরিয়ে 'হেড-মাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং অন্যান্য দু' একটি বামপন্থী সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে শিক্ষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অন্য নামে সংগঠন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সেই সংগ্রামী ঐক্যের ঐতিহ্যই পশ্চিমবঙ্গকে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গে পরিণত করেছে।

৪

স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে চা বাগিচায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা

পঞ্চাশের দশকের একেবারে প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৫২ সাল থেকে চা শিল্প তথা বাগিচা শিল্পের ওপর এ আই টি ইউ সি বিশেষ ভাবে নজর দিতে আরম্ভ করে।

অন্যান্য শিল্পের মতোই চা বাগিচাতেও মালিকদের সাহায্যে এবং উদ্যোগে '৪৮ সালে মার্চ মাসের পর থেকে এ আই টি ইউ সি-র সংগঠিত বাগানগুলিতে এবং অসংগঠিত বাগানগুলিতে, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে, আই এন টি ইউ সি ইউনিয়ন গঠন করতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হবার পর তার সুযোগ মালিকরা এবং সরকার গ্রহণ করে। ১৯৪৮-৫২ সাল এই চার বছর কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামে চা শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়ার কাজে যে সমস্ত পার্টি-কর্মী নিয়োজিত ছিলেন তাদের সবাইকেই গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল অথবা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল। আসামে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে চা শ্রমিক সংগঠন প্রথম গড়েছিল কমিউনিস্ট কর্মীরা। দার্জিলিঙে চা বাগানে প্রথম ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং কিছু কিছু বাগানে সংগঠন তৈরী হয় ১৯৪৫ সালে। প্রথম ইউনিয়নটির নাম হয় দার্জিলিঙ ডিস্ট্রিক টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। রেজিস্টার্ড নং ছিল ৭০৭। ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন কম্‌ রতন লাল ব্রাহ্মণ, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন কম্‌ ভদ্রবাহাদুর হামাল। ১৯৪৬

সালের প্রথমদিকে জলপাইগুড়ি জেলায় 'চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' নামে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। তার প্রথম সম্পাদক হন শুকদেও লরেন্স লারকা (শুকদেও ওঁরাও)। পরে এই ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটল ঘোষ) এবং সভাপতি ছিলেন রতনলাল ব্রাহ্মণ।

এই দুই জেলাতেই প্রাথমিক অবস্থায় প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চা বাগানে ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হয়। চা বাগান এলাকা-গুলো তখন ছিল চা মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বাগানের ম্যানেজারের অনুমতি ব্যতিরেকে বাগানগুলোতে এমন কি সরকারী কর্মচারীদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বাগানে বাইরের কেউ প্রবেশ করলে, ম্যানেজাররা তাদের গুণ্ডা দিয়ে হত্যা করত, বাগানের বিস্তৃত জমির কোন এক জায়গায় পুঁতে ফেললেও কেউ জানতে পারত না। এইটা তখনকার দিনে চা বাগানের ম্যানেজারদের পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল। স্বাধীনতার পূর্ব যুগের কথাতো দূরের কথা, এমন কি স্বাধীনতার পরের যুগে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্তও বাইরের কোন লোকের বাগান এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং বে-আইনি ছিল। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রতনলাল ব্রাহ্মণ দার্জিলিং জেলার চা বাগান অঞ্চল থেকে প্রার্থী হন। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের এই প্রচারের মাধ্যমেই দার্জিলিঙের ইউনিয়নটি গড়ে ওঠে '৪৫ সালের শেষ ভাগে। এই নির্বাচনের প্রচার অভিযানের সময়েও ইংরেজ বাগানের সাহেব মালিকরা বাগানগুলোতে তো প্রবেশ করতে দেয়ইনি, এমন কি বাগান এলাকার পাশ দিয়ে যে জেলাবোর্ডের রাস্তা গেছে, সেই রাস্তাগুলোতেও রতনলাল ব্রাহ্মণের যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ম্যানেজাররা নিজেরাই কিছু চৌকিদার

দফাদারদের নিয়ে বন্দুক নিয়ে এসে পথের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকত যাতে রতনলাল ব্রাহ্মণ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যেতে না পারে অথবা সভা করতে না পারে। ফলে রতনলাল ব্রাহ্মণেরও পার্টির সঙ্গীদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে খোলা খুরকি হাতে (এক রকমের বড় ছোরা, নেপালীদের ও শিখদের কৃপানের মতোই জাতীয় বৈশিষ্ট্য) ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় চলাফেরা করতে হোত। সমস্ত ভারত জুড়ে সেই সময় প্রচণ্ড ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চলছিল। আজাদ-হিন্দ দিবস ও রসীদ আলী দিবসে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। তার প্রভাব একদিকে যেমন বাগিচা শ্রমিকদের উৎসাহিত করেছিল অন্যদিকে বাগানের সাহেব ম্যানেজারদের মধ্যেও কিছুটা হতাশা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ফলে ম্যানেজাররা শেষ পর্যন্ত আর রতনলাল ব্রাহ্মণদের ওপর গুলি চালিয়ে একটা প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে সাহস পায়নি। রতনলাল ব্রাহ্মণ বাগানের পর বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ঐ সময় অসংখ্য সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখেন। দার্জিলিঙ-এর চা বাগানের শ্রমিকরাও এই প্রথম লাল ঝাণ্ডা দেখতে পেল। ঐ সময় অনেকগুলো দাবি দাওয়া গড়ে ওঠে—কিছু কিছু বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকের সংঘর্ষ হয়। এই সব সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দার্জিলিঙের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে।

জলপাইগুড়ি অর্থাৎ ডুয়ার্সের চা বাগানের ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস একটু অন্য রকম। জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা নদীর অপর পারে 'বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে' ছিল তখন ডুয়ার্সের অভ্যন্তরে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। এই বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে ইউনিয়ন ছিল একজন সংস্কারবাদী নেতার হাতে। পরবর্তী কালে এই ইউনিয়নটি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে চলে আসে। তারপর এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হন বীরেন দাশগুপ্ত

এবং সহ-সভাপতি হন পরিমল মিত্র। এই ইউনিয়নের ভেতর সমস্ত গ্যাঙম্যানরাই সংগঠিত ছিল। এই গ্যাঙম্যানরা ছিল আদি-বাসী শ্রমিক। এদেরই আত্মীয়-স্বজনরা সবাই চা বাগানে কাজ করত, না হয় চা বাগানের আশেপাশে আধিয়ারের (ভাগচাষী) কাজ করত। ফলে এই সব আদিবাসী গ্যাঙম্যানদের বাগানে অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে তাদের মারফতেই ডুয়ার্সে চা বাগান শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রয়াত কম্ দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন এই গ্যাঙম্যানদের অন্যতম নেতা। জলপাইগুড়ি জেলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই এই চা বাগান শ্রমিকদের সংগঠিত করা হয়।

শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে বাগিচা মালিক ও আই এন টি ইউ সি-র ভূমিকা

এই অবস্থাতেই অর্থাৎ যখন সবেমাত্র চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠছিল, তখনই কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হয়ে যায় এবং সমস্ত নেতারা গ্রেপ্তার হন। একমাত্র দেবপ্রসাদ ঘোষ গ্রেপ্তার এড়িয়ে গোপনে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ১৯৫২ সালের পর আবার নেতারা আস্তে আস্তে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় শ্রমিকদের মধ্যে আই এন টি ইউ সি-র এবং মালিক কর্তৃক সৃষ্ট বিভেদ নিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই জলপাইগুড়ির আই এন টি ইউ সি এবং দার্জিলিঙে গুর্খা লীগ কর্তৃক সংগঠিত ইউনিয়ন, যাদের মালিকরা সাহায্য করেছিল ইউনিয়নগুলি গড়ে তুলতে, তারা শ্রমিকদের স্বার্থ খুব কমই রক্ষা করতো। এখানেই কমিউনিস্ট পরিচালিত এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়ন এবং গুর্খা লীগদের পরিচালিত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘাত

বাধে। গুর্খা লীগ এবং আই এন টি ইউ সি কমিউনিস্টদের শত্রু হিসাবেই গণ্য করে এবং সেই ভাবেই প্রচার করতে শুরু করে। এবং কিছু কিছু জায়গায় এ আই টি ইউ সি-র কর্মীদের ওপর দৈহিক বল প্রয়োগও শুরু করে। তাদের সাহায্য করে বাগানের কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ।

১৯৫২ সালে উত্তর পূর্ব ভারতের চায়ের দাম অস্বাভাবিকরূপে কমে যেতে থাকে। হঠাৎ পড়ে যাওয়া চায়ের দামের কারণ মালিকরা দেখায় উৎপাদন বেশী হয়েছিল কাজেই চায়ের দাম পড়ে যাচ্ছে। আসল কারণ কিন্তু মোটেই তা নয়—এটা ছিল চা শিল্পের ইংরেজ মালিকদের সৃষ্ট একটি সংকট। এই সংকট সৃষ্টি করার দুটি কারণ ছিল—যা এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ন্যূনতম বেতন আইন চালু করেন এবং এই আইন অনুসারে ৫০ সালে রাজ্যে রাজ্যে চা বাগানে বেতন কমিটি গঠিত হয়। এর পূর্বে চা বাগানের শ্রমিকদের বেতনের কোন স্থিরতা ছিল না। বিভিন্ন বাগানের মালিকদের ওপর নির্ভর করতো সেই সেই বাগানে শ্রমিকেরা কতো বেতন পাবে। বেতনের কোন সমতা ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার বাগানের শ্রমিকদের জন্য একটি শিল্প কমিটি সভা আহ্বান করেন। সেখানেই প্রথম শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন মোটামুটি একটা সমতার মধ্যে আনা হয় এবং মহার্ঘভাতা বেতনের সঙ্গে চালু হয়। ১৯৫১ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী ন্যূনতম বেতন কমিটি ১৯৪৭-৪৮ সালের নির্ধারিত বেতন সামান্য বাড়িয়ে দেয়। এই বেতন বৃদ্ধি চা-মালিকরা মানতে রাজী ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ-পূর্বযুগে এবং যুদ্ধোত্তর কালেও ভারতের চায়ের নীলামের মূল কেন্দ্র ছিল লণ্ডন যেখানে তারা চায়ের দাম ইচ্ছা মতো ওঠান নামান করত। স্বাধীনতা উত্তরকালে কংগ্রেস সরকার

লণ্ডনে নীলাম বাজার তুলে দিয়ে কলকাতা নীলাম বাজারের ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ইংরেজ মালিকরা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে।

উত্তর ভারতের চা শিল্পের তদানান্তন অবস্থা

এখানে আমাদের তদানীন্তন উত্তর ভারতের চা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে বলা দরকার। চা শিল্প ছিল সম্পূর্ণরূপে ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসের করতলগত। এরা একাধারে বাগানের মালিকানা, নীলাম বাজাবেব মালিকানা, রপ্তানী বাজারের মালিকানা, বাগানের যন্ত্রপাতি এমন কি চা বাক্স সরবরাহেব একচেটিযা মালিকানা এবং সর্বোপরি টাকা ঋণদানকারী ব্যাংকগুলিব এবং কোলকাতা-আসাম-গামী চা বাক্স পরিবহণকারী জাহাজগুলোর মালিকানা—এই সবই ঐ ১৩টি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসের হাতে ছিল। অর্থাৎ সমগ্র চা শিল্প তার উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে মূল্য নির্ধারণ, আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে নিযে আসা এবং বিদেশে পবিবহন করার ভার যেহেতু এই ১৩টি ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসের হাতে ছিল, সেহেতু চায়ের দাম কখন বাড়বে কখন কমবে তা ওদের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করত। চা শ্রমিকদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, এমন কি সদ্য স্বাধীন ভারত সরকারকেও তারা গ্রাহ্য করত না। ভারত সরকারকে গ্রাহ্য না করার আরেকটি কারণ ছিল—তখন পর্যন্ত ভারতে চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য প্রায সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত বিলেতের বাজারের ওপর। তখন পর্যন্ত অন্য কোন বাইরের বাজারে ভারতের চা যেতো না। বাইরে যা চা বিক্রী হোত তা লণ্ডনের মালিকরা লণ্ডন নীলাম বাজার থেকে বিক্রী করতো। ফলে ভারত সরকারও এই বিদেশী মালিকদের ওপর চা রপ্তানীর জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল।

১৯৫২ সালে চায়ের দাম যখন অস্বাভাবিক রকম পড়ে গেল এবং চায়ের সংকট বলে ইংরেজ মালিকরা চিৎকার শুরু করল, তখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে এবং ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর পক্ষ থেকেও চা শিল্পের ওপর ব্যাপক তদন্তের জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ দেওয়া হতে থাকে। ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে সমস্ত বাগিচা শিল্পের ওপর তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। ভারত সরকারের তদানীন্তন শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের যুক্ত সচিব শ্রীমাধবন মেনন (আই সি এস)-কে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে কমিশন বসান হয়। কমিশনের নাম দেওয়া হয় বাগিচা শিল্প তদন্ত কমিশন। কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রী কে জি শিবস্বামী ছিলেন দিল্লী স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের রিসার্চ এসোসিয়েট। তিনি রিপোর্টে লিখেছেন—

"বাগিচা শিল্প একটি ঔপনিবেশিক অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই শিল্পের কাঠামো ছিল অত্যন্ত ব্যয়সম্পন্ন এবং অত্যধিক ব্যয়সম্পন্ন তদারকি অফিসার (ম্যানেজার) দ্বারা পরিচালিত। উচ্চ মুনাফা, অত্যধিক লভ্যাংশ, ম্যানেজিং এজেন্টদের উচ্চহারে কমিশন দেওয়া এবং অত্যন্ত স্বল্প সঞ্চয় (রিজার্ভ) হোল এই শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উচ্চহারে দালালদের কমিশন, উচ্চহারে গুদাম ভাড়া, উচ্চহারে জিনিষপত্র সরবরাহ করা এবং উচ্চহারে জাহাজ ভাড়া এ সবই এ অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ ছিল। এই রকম একটি কাঠামো একমাত্র রাষ্ট্রের বিভিন্নভাবে সাহায্যের উপরই টিকে থাকতে পারে। আগেকার প্রশাসন ঠিক এই জিনিষই করে গেছে—প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত জমি চা গাছের জমির বাইরে এদের কিছু উদ্বৃত্ত আয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—এদের কাছ থেকে নামমাত্র ট্যাক্স আদায় করা হোত এবং শ্রমিকদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু স্বাধীনতার পর সরকার চা বাগানের উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করতে শুরু করে অথবা

জমিগুলোর ওপর কিছুটা বাধানিষেধ আরোপ করা হয়, ট্যাক্সও বাড়তে থাকে এবং আইন করে শ্রমিকদের বেতনও বাড়ান হয়। নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকেই ইংরেজ মালিকদের মনোভাব বোঝা যায়—ভিকিজার লিখছে: "কিছু কিছু ইংরেজ মালিকের কাছে বর্ধিত হারে রপ্তানী শুল্ক ছিল সরকারের লুঠ, এবং তা করার সময় মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি অথবা অন্য কোন ভাতা দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।" এই সময় শ্রমিকরা অর্থাৎ ১৯৫৪ সাল থেকে বোনাসের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মেনন কমিটি সুপারিশে বলেছিলেন, "এই শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হোল উৎপাদনের কেন্দ্রীভূত অবস্থা। উত্তর ভারতের সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৫২ ভাগ ছিল সাতটি অভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সীর হাতে, চারজনে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনের শতকরা ৩২.২ ভাগ এবং তেরটি ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন হয় উত্তর ভারতের মোট ৪৮১ মিলিয়ন পাউণ্ড চায়ের মধ্যে ৩৭১ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী (৩য় পরিচ্ছেদ)।"

১৯৫২ সালে এই ইংরেজ মালিকরাই বাজারে উত্তর ভারতের চায়ের দাম অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দিল। অথচ চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানীর চিত্র দেখলে এরকম অস্বাভাবিকভাবে দাম কমে যাবার কোন কারণ দেখা যায় না। দাম কমে যাবার ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই সরকারের আয় কমে গেল। এই তথাকথিত সংকটের অজুহাতে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের মদতে চা মালিকরা বাগানের পর বাগানে একতরফাভাবে সাতদিনের জায়গায় ৫ দিনের কাজ চালু করে। অন্যদিকে রেশনের দাম দ্বিগুন/তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়। এটা সমগ্র উত্তর ভারতের শ্রমিকদের উপর চা-বাগান মালিকদের সুপরিকল্পিত আক্রমণ ছিল।

চা শিল্পেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠল

১৯৫২ সালের ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর ভারত সরকার কলকাতায় একটি ত্রিদলীয় বাগিচা শিল্প সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ও পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি। উল্লেখযোগ্য এই সম্মেলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই, সম্মেলনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জী শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সঙ্গে কোন রকম আলোচনা ব্যতিরেকেই দার্জিলিং-এর শ্রমিকদের রেশনের দাম বাড়িয়ে বেতন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমিয়ে দিলেন। এই বেতন কাটার কারণ হিসাবে তাঁদের বক্তব্য ছিল ইংরেজ বাগিচা মালিকদের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। ব্যাপকভাবে বন্ধ বাগিচাগুলির শ্রমিকদের দুর্দশা, অনাহারে মৃত্যু কোন কিছুই কংগ্রেস সরকার গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

উপরে উল্লেখিত শিল্প সম্মেলনে আই এন টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে তদানীন্তন চা শ্রমিক নেতা ও সেই ইউনিয়নের সভাপতি আসামের কে. পি. ত্রিপাঠী (তিনি তখন পার্লামেণ্টের সভ্যও ছিলেন) তাঁর ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে খুব জোরালো ভাষায় ইংরেজ মালিকদের অভিযুক্ত করে বলেন যে "এটা সত্যিকারের সংকট মোটেই নয়, এটা মনুষ্য সৃষ্ট। উত্তর ভারতের কয়েকটি ইংরেজ চা-বাগান মালিকের আধিপত্য ও সমস্ত বিষয়ে তাদের কর্তৃত্বের বিষয়ে সরকারের তদন্ত করা উচিত।" ঐ সম্মেলনে এ আই টি ইউ সি-র প্রতিনিধিত্ব করেন এস. এ. ডাঙ্গে ও মনোরঞ্জন রায়। এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে বক্তব্য একটি স্মারকলিপির আকারে পেশ করা হয়। তাতে তদানীন্তন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ইংরেজ মালিকদের তোষণকারী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। (প্রতিবেদনটি পরে দেওয়া হল।) ঐ সম্মেলন থেকেই আই এন টি ইউ সি ও অন্য ইউনিয়নগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে এই সম্মেলনের পর বাংলা, হিন্দী, নেপালী ও অসমীয়া ভাষায় চা শ্রমিকদের কাছে আবেদন করা হয় চা বাগিচা মালিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে। ইস্তাহারটি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের তিনটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় (ইস্তাহারটি পরে দেওয়া হল)। ১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর যখন সবেমাত্র লালঝাণ্ডা ইউনিয়নগুলি সক্রিয় হয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল, সেই সময়েই এই আক্রমণ চা শ্রমিকদের মধ্যে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি করে।

১৯৫২ সাল থেকে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (WFTU) তার মুখপত্রগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলন বিশ্লেষণ করে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রমিক-শ্রেণীকে সচেতন করতে মাসের পর মাস চেষ্টা চালিয়ে যায়। উত্তর ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টায় বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই ছিল।

১৯৫২ সালের শেষের দিক থেকেই এই ঐক্য প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। ঐ সময়, অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে ডুয়ার্সে সাদ্রী ভাষায় "নয়া জমানা" বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এ আই টি ইউ সি-র উদ্যোগের ফলে। এর সম্পাদক ছিলেন ডুয়ার্সের হা-হাই পাথার (পরে 'রূপালী চা-বাগান'). চা বাগানের শ্রমিক ও ডুয়ার্সের চা শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক প্রয়াত কমরেড ফাগু ওঁরাও। পত্রিকাটি পাক্ষিক ছিল। এটি কেবল ডুয়ার্স-তরাই-এর ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল

শ্রমিকদের জনপ্রিয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুদূর রাঁচীতেও পত্রিকাটির যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চাশের দশকে চা শিল্পেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শিল্পভিত্তিক এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। চা শ্রমিকদের এই ঐক্য পরবর্তীকালে ষাটের-সত্তরের দশকে আরো ব্যাপক হয় এবং ষাটের দশকের শেষে আই এন টি ইউ সি সহ দলমত নির্বিশেষে চা শ্রমিকদের সমস্ত ইউনিয়নগুলির প্রায় একটা স্থায়ী সমন্বয় কমিটিতে পরিণত হয়। এই সমন্বয় কমিটি একদিনে গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে এই কমিটি গড়ে উঠেছে। আজও চা শিল্পে প্রতিটি শিল্পভিত্তিক আন্দোলনে এই সমন্বয় কমিটিই নেতৃত্ব দেয়। পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের মধ্যে আজ সি আই টি ইউ প্রধান শক্তি হিসাবে যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমতঃ আজ সেখানে যাঁরা সি আই টি ইউ নেতা তাঁরাই এ আই টি ইউ সি-তে থাকাকালীন শ্রমিক ঐক্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলনের পুরোভাগে এঁরাই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই চা শ্রমিকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে কারা শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিক ঐক্য গড়ে তুলেছেন এবং সঠিক নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন। তাই আজ সমগ্র দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে, তরাই ও ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা সি আই টি ইউ ইউনিয়নগুলিতে ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়েছেন।

এই পরিস্থিতির পশ্চাদপট বোঝার জন্য ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তিনটি ইউনিয়নের যুক্ত ইস্তাহার দেওয়া হ'ল। সেটিকে বলা চলে ১৯৪৮-৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালঝাণ্ডা ইউনিয়নগুলির সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত হবার পর আবার যখন আইনী হল তারপর চা শ্রমিকদের কাছে এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে প্রথম ইস্তাহার।

এ ছাড়া ভারত সরকারের কাছে এবং ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত চা শিল্প সম্পর্কে তিনজনের তদন্ত কমিটির নিকট প্রতিবেদন দুটিও তদানীন্তন চা শিল্প ও চা শ্রমিকদের অবস্থা বোঝার পক্ষে সাহায্য করবে। তাই ঐ প্রতিবেদন দুটিও দেওয়া হল :—

১৯৫২ সালের যুক্ত ইস্তাহার : সমস্ত চাবাগানের শ্রমিকের কাছে আহ্বান ঐক্যবদ্ধ হও সংগ্রামের পথে এগিয়ে চল

সরকার ও চাবাগান মালিকরা মিলিত ভাবে দার্জিলিং ও আসামের দেশীয় মালিকদের বাগানে চালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য জায়গাতেও দাম বাড়াতে চাইছে। এর অর্থ হোল আমাদের মজুরী কমিয়ে আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। অনেক মালিক চাবাগান বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।

মালিক বলছে চায়ের দাম কমে গেছে। লোকসান হচ্ছে। তাই বাগান বন্ধ করা, মজুরী কাটা আর কম দামে সরবরাহ করা চাল কমাতে হচ্ছে। আজ পর্যন্ত আমরা যত দাবী আদায় করেছি সেসবই মালিক শেষ করে দিতে চাইছে। 'চাবাগান লোকসানে চলছে,' মালিকের এই কথা আমরা বিশ্বাস করতে রাজী নই। যদি সত্যিই কোন মালিকের লোকসান হয়ে থাকে তো সে আগে সরকারকে দিয়ে কর ইত্যাদি কম করাক, নবাবী চালে চলা কমাক। মালিকের লোকসানের আওয়াজ শুনে আমরা শ্রমিকরা নিজেদের জীবন বরবাদ করতে রাজী নই। মজুরী কাটার জন্য, আর পূর্ব্বের ন্যায়ই ইচ্ছেমত লাভ করার জন্য মালিক চায়ের দামে মন্দার কথা বলছে। চায়ের তেজী বাজারে মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটেছে। তবুও আমাদের পেট ভরে খাওয়ার মত মজুরী দেয়নি। দামে

অল্প একটু মন্দাভাব আসতে না আসতেই মালিক আমাদের মজুরী কাটবার জন্য চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের নেহরু সরকার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সবকারও মালিকদের মদত দিচ্ছে।

ইউনিয়নে ও কাউন্সিলে ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মজুরী কাটার বিরোধিতা করেছেন। মালিক পক্ষ, শ্রমিক পক্ষ ও সরকারী অফিসারবর্গ দিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও ডেকেছিল সরকার। সেই বৈঠকে স্থির হয়েছিল যদি সরকার কর কমিযে দেয় তবে মালিকপক্ষ বাগান বন্ধও করবে না, মজুরীও কাটবে না। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, রাষ্ট্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ মজদুর সভা ও সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—সমস্ত শ্রমিক সংগঠন ও দেশী ও সাদা মালিকরা সবাই নিম্নলিখিত প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন ঃ—

"এই কমিটি (শ্রমিক মালিকের যৌথ কমিটি) বুঝেছেন যে সরকারী অফিসারদের রিপোর্ট সন্তোষজনক নয়। সরকারী অফিসাররা চাবাগান ও চা শ্রমিকদের বহু বিষয়েই সঠিক হিসাব পেশ করেনি। সরকারী রিপোর্টের ভিত্তিতে 'কোন সমাধান করা যাবে না। তাই কমিটি (মালিক শ্রমিকের যুক্ত কমিটি) প্রস্তাব করছেন যে চাবাগানের খরচের বিষয়ে তদন্ত করায় সরকার যেন আর দেরী না করেন। এলাকা সাব কমিটির সংগে মালিক, শ্রমিক ও সরকারী প্রতিনিধি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠন করা হোক। কমিটি যতোদিন পর্যন্ত রিপোর্ট না দেবে ততদিন পর্যন্ত বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে নিম্নলিখিতভাবে আদায়কৃত কর ফিরিয়ে দেবার জন্য কমিটি সুপারিশ করছে।

কাছাড়, দার্জিলিং আর ত্রিপুরা	—পাউণ্ডপিছু	তিন আনা
ডুয়ার্স, তরাই ও মধ্য ত্রিবাঙ্কুর	— ” ”	দুই আনা
আসাম ও মাদ্রাজ	— ” ”	এক আনা

কমিটি এও বলেছেন যে যতদিন পর্যন্ত পুনরায় নোটিশ না দেওয়া হয় ততদিন পর্যন্ত গত পয়লা এপ্রিল থেকে উপরোক্ত এলাকাগুলো থেকে প্রেরিত চালানে একই হিসাবে আদায়ীকৃত কর ফেরত দিতে হবে। যেসব বাগান বন্ধ হয়ে গেছে আর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সাহায্য দেবার পরও চালু হয়নি সেইসব বাগান কর ছাড়ের সুযোগ পাবে না। ১৯৫১-৫২ সালে যেসব বাগানে লোকসান হয়েছে সেইসব বাগানের বাজেয়াপ্ত করা বন্ধকী সম্পত্তির উপর উপরোক্ত সময়ে যে লোকসান হয়েছে তা মিটিয়ে দিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে হবে। যদি সরকার মনে করেন যে কোন বাগানে ১৯৫২-৫৩ সালে লোকসান হয়নি তবে সেইসব বাগানে কর ছাড় বাবদ যে টাকা মালিকদের ফেরত দেওয়া হবে, সেই টাকায় শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণ, চিকিৎসা, স্কুল ইত্যাদির জন্য খরচ করতে মালিককে বাধ্য করুন। মালিকপক্ষকে রাজী করাতে হবে যে যেহেতু সরকার সাহায্য করছেন সেইহেতু যতদিন পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত না হচ্ছে, ততদিন কোন বাগান বন্ধ হবে না, ছাঁটাই হবে না, শ্রমিকদের মজুরী কমানো হবে না। যেসব মালিক এই শর্ত মানতে রাজী আছেন কেবল তাঁদেরই কর ছাড় দেওয়া হোক। মালিকপক্ষ এই চেষ্টাও করবেন যাতে এবছর বন্ধ হয়ে যাওয়া বাগানগুলি আবার চালু করা যায়।

যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবে রাজী থাকেন তবে যতদিন পর্যন্ত না ত্রিপাক্ষিক কমিশনের তদন্ত শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কোন প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের কোন রকম সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার থাকবে না যাতে কোনভাবে শ্রমিকদের মজুরী কমে যায়। অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরী আইন অনুযায়ী যে মজুরী ঠিক করা আছে তার চেয়ে কোনরকমে কম যেন না হয়।”

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী মদত দেবার বদলে চালের দাম দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে আট টাকা

থেকে বাড়িয়ে সতেরো টাকা আট আনা করে আমাদের শুকিয়ে মারার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

আন্দোলনের পথে ঐক্যবদ্ধ হয়েই কেবল আমরা মালিকদের আক্রমণ রুখতে পারি। এক জোট হয়ে আন্দোলন করলেই আমরা আমাদের বেকার ভাইদের সাহায্য করতে পারি আর সরকারকে বাধ্য করতে পারি ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে।

তাই আমরা সমস্ত শ্রমিক ভাই ও তাঁদের ইউনিয়নগুলির কাছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন করছি। যেরকম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সময় চাবাগান শ্রমিকরা ও তাঁদের ইউনিয়নগুলি গড়ে তুলেছিলেন, নিজেদের রাজনৈতিক পার্থক্য ভুলে গিয়ে সেরকম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আবার গড়ে তোলা দরকার।

চাবাগান শ্রমিকদের চাকরী বা জীবন বজায় রাখার উপর নির্ভর করছে অন্যান্য রাজ্যেরও লাখো মানুষের রুটি রুজি। তাই আমরা সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করছি চা বাগান শ্রমিকদের সাহয্যে এগিয়ে আসুন।

(ক) মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা মানার জন্য;

(খ) চা বাগানের বেকার ভাইদের দ্রুত সাহায্য করার জন্য;

(গ) সপ্তাহে ছদিন কাজ চালু করার জন্য;

(ঘ) মজদুর আইন বা বস্তীতে যাবার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার পুরো অধিকারের জন্য;

সমাবেশ করুন, মিছিল করুন, সরকারী আমলাবর্গের কাছে প্রস্তাব আর নিজেদের প্রতিনিধি পাঠান। আর—

(১) কাজের বোঝা কমানোর জন্য;

(২) সামগ্রিক মজুরী হ্রাসের বিরুদ্ধে ;

(৩) শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী ন্যূনতম মজুরী আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে ;

(৪) সস্তায় রেশনের বদলে রেশনের দাম বাড়ানের বিরুদ্ধে ;

সমস্ত চা-বাগান ও এলাকায় এলাকায় ঐক্যবদ্ধ জোরদার আন্দোলন শুরু করুন।

চা-বাগান শ্রমিকদের জয় অনিবার্য।

চা-বাগান শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ।

বিনীত—

দার্জিলিঙ চিযাবাগান মজদুর ইউনিয়ন, চা মজদুর ইউনিয়ন আসাম (ডিব্রুগড়), ত্রিপুরা রাজ্য টি ওযার্কার্স ইউনিয়ন, জলপাই-গুড়ি জেলা চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন (উপরোক্ত সব কয়টি ইউনিয়নই সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অর্থাৎ এ. আই. টি. ইউ. সি.-র অন্তর্ভুক্ত)। ৩১. ১২. ৫২

শ্রমিকদের কাছে এই ইস্তাহারটি দেবার পূর্বে কোলকাতায় বাগিচা শিল্পের উপর তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী প্রয়াত ভি. ভি. গিরির (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) সভাপতিত্বে যে ত্রিদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার সামনে এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ঐ সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয়গুলি সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—

(১) শ্রমিকদের মজুরী কতটা কমানো যায় তার প্রশ্ন ;

(২) শ্রমিক ছাঁটাই-এর প্রশ্ন ;

(৩) চায়ের গুণমান উন্নতির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত উৎপাদন খরচ কমানো ;

(৪) ভর্তুকি দিয়ে স্বল্প দামে রেশন সরবরাহের বদলে কিছু

বাড়তি পয়সা দিয়ে রেশন সরবরাহকে টাকায় রূপান্তরিত করার প্রশ্ন ;

(৫) ছাঁটাই ও তথাকথিত বাড়তি শ্রমিক অন্য বাগানে স্থানান্তরিত করার প্রশ্ন ; এবং

(৬) চা বাগান বন্ধ হয়ে যাবার প্রশ্ন।

ঐ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিক পক্ষের তরফ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানানো হয়—'শিল্পের স্বার্থে শ্রমিকদের কিছুটা আত্মত্যাগ করার জন্য'।

এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয় তাতে বলা হয়েছিল 'শ্রমিকদের তরফের আত্মত্যাগের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না, কারণ আত্মত্যাগ করার মত তাঁদের কিছুই নেই। তাদের কাছে আত্মত্যাগের একটাই মানে ; অনাহার ও মৃত্যু।'

ঐ স্মারকলিপিটিতে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের কথা ওঠার আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল—অবশ্যই আমাদের জানতে হবে 'এজেন্সী হাউস' ডাইরেক্টররা, বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেটরা, ম্যানেজাররা ও মোটা বেতন ভোগী অফিসাররা, ব্রোকাররা, (ওয়ারহাউস এজেন্সী) গুদাম মালিকরা, টি ডি এল-এর সেক্রেটারী ও অন্যান্য মোটা বেতন ভোগী কর্মচারীরা চা শিল্পের উপর থেকে অতি উচ্চহারে ব্যয়ভার কমাতে কি স্বার্থ ত্যাগ করবেন ?

১৯৫১ সালে তদানীন্তন আই সি এস অফিসার এস আর দেশপাণ্ডের উপর চা শিল্পের শ্রমিকদের বেতন তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। মিঃ এস আর দেশপাণ্ডে শ্রমিকদের কত বেতন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সুপারিশ করেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের শেষ দিকে ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম বেতন আইন অনুযায়ী একটি ত্রিদলীয় কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি মিঃ দেশপাণ্ডের সুপারিশের চেয়েও শ্রমিকদের কম বেতন ধার্য করেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার অনুষ্ঠিত

ত্রি-দলীয় সম্মেলন ঐ ন্যূনতম বেতনকেও কমাবার প্রস্তাব করে।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার একটি "টি টিম" গঠন করে তাদের উপর তাৎক্ষনিক চা শিল্পের উপর সুপারিশ করবার জন্য নির্দেশ দেয়। "টি টিমের" রিপোর্টে দেখা যায়, যে ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি হয়েছে তাতে দক্ষিণ ভারতে 'আধ আনা' এবং উত্তর ভারতে 'এক আনা' এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে 'দেড় আনা' চায়ের পাউণ্ড পিছু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। ('টি টিমে'র রিপোর্ট—পৃঃ ৪৬)

ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী উৎপাদন ব্যয় হতো উত্তর ভারতে পাউণ্ড পিছু সাড়ে কুড়ি পয়সা ও দক্ষিণ ভারতে ১৮.০৬ পঃ। কাজেই আধ আনা, এক আনা, বা দেড় আনা শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচের উপর বাড়তি বোঝার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

তা ছাড়া আইন অনুযায়ী যে মজুরী ধার্য করা হয়েছে তা থেকেও শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছিল।

পরিবারের কোন সদস্যের অনুপস্থিতির জন্য সমগ্র পরিবারের সমস্ত সদস্যের রেশন বন্ধ করে তাদের আয়ের উপর আঘাত করা হচ্ছিল। সপ্তাহে ৩/৪ দিন কাজ কমিয়ে দেওয়া, কাজের বোঝা বাড়ানো, জরিমানা করা ইত্যাদি নানা ছুতোয় ন্যূনতম আইন অনুযায়ী যে মজুরী নির্ধারিত হয়েছিল আসলে শ্রমিকদের তার চাইতে কম বেতন দেওয়া হচ্ছিল।

এসব করা হচ্ছিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের আলোচনার সময় মন্ত্রীদের দৃঢ় আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও যে শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু করা হবে না। যদি কিছু করা হয় তা হবে কেবলমাত্র শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য।

উৎকৃষ্ট মানের চা উৎপাদন অবশ্যই শ্রমিক প্রতিনিধিরাও চান। কিন্তু এটার জন্য মিহি পাতি তোলার প্রয়োজন। এই মিহি পাতি তোলার জন্য যে নাম মাত্র পয়সা দেওয়া হয় তার হার

না বাড়ালে, পাতা তোলার পরিমাণ না কমালে উৎকৃষ্ট মানের তথা অতি মিহি পাতি তোলা সম্ভব নয়। বরং উন্নত মানের চায়ের উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির পাউণ্ড প্রতি পাতি পয়সার হার বৃদ্ধির প্রয়োজন। দিনপ্রতি পাতি তোলার পরিমাণ কমানো অবশ্যই প্রয়োজন।

চা উৎপাদনের ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে, সমস্ত শ্রমিক প্রতিনিধিরা ত্রি-দলীয় সম্মেলনে যে প্রস্তাব করেছিল সেই প্রস্তাব অনুযায়ী চা শিল্পের সমস্ত দিক নিয়ে পূর্ণ তদন্ত হওয়ার পরই। ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকের সামনে এ আই টি ইউ সি যে স্মারক-লিপি দিয়েছিল তাতে শ্রমিক ছাঁটাই করার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সরকারকে ব্যবস্থা নেবার দাবি করা হয়।

বহু পূর্ব থেকে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় থেকে শ্রমিকদের স্বল্পমূল্যে খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিষ সরবরাহ করা হতো—যেমন চাল, গম, ডাল, ভোজ্যতেল, গুড়, কেরোসিন তেল, কাপড় ইত্যাদি। যুদ্ধের পর ন্যূনতম বেতন ধার্য করার সময়ই ১৯৫১ সাল থেকে একমাত্র চাল ও গম সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা ছাড়া অন্য সমস্ত জিনিষই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে শ্রমিকদের মজুরীর থেকেই ঐ সমস্ত জিনিষগুলো বাজার থেকে বেশী দামে কিনতে হতো। ফলে শ্রমিকদের সত্যিকারের মজুরী হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৫২ সালেই চা মালিকরা রেশন সরবরাহ বন্ধ করে তার বদলে কিছু বাড়তি পয়সা দেবার প্রস্তাব করে। অজুহাত ছিল সুলভ মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করলে তাদের লোকসান খুব বেশী পরিমাণে হয়। রেশন মালিকদের রেশন জোগাড় করার অসুবিধার অজুহাত দেখানো হয়। এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'টি টিম' কতকগুলি সুপারিশ করে। সেই সুপারিশগুলি গ্রহণ করলে চাল, গম সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হতো না। কাজেই মালিকদের এই রেশন বন্ধ করে

দেবার অজুহাত শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

এর পরের প্রশ্ন—

(১) বাগান বন্ধ করে দেওয়া; (২) শ্রমিক ছাঁটাই; (৩) তথাকথিত বাড়তি শ্রমিকদের সম্পর্কে কি করণীয়।

প্রথমতঃ চায়ের বাড়তি মূল্য পেতে হলে মিহি পাতি তোলার প্রয়োজন;

দ্বিতীয়তঃ মিহি পাতি তুলতে হলে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে হয়। কারণ বাগানের এক একটা চক্র প্রতি সাত দিনে একবার করে সম্পূর্ণ করা অবশ্য করণীয় কাজ। ছয় দিনের (এক সপ্তাহ) মধ্যে একেক চক্রের পাতি তোলা শেষ করতে হলে বেশী বেশী শ্রমিক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তাছাড়া শীতকালে পাতি তোলা যখন বন্ধ হয় তখন গাছের প্রুনিং স্কিপিং (গাছের উপর দিক ছাঁটাই করা), এ ছাড়া গাছের গোড়া পরিষ্কার করা—অন্যান্য কাজগুলো যা চা গাছ রক্ষা করার জন্য এবং উন্নতমান ও বর্দ্ধিত হারে চা পাতা পাওয়ার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়, তার জন্য বেশী সংখ্যক শ্রমিক সারা বছরব্যাপী নিয়োগ করা প্রয়োজন। এখানে শ্রমিক ছাঁটাই এর অর্থ হলো ঐ সব কাজগুলো অবহেলা করা যেটা শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

খরচ কমাবার নাম করে বাগিচা মালিকরা কর্মরত শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল আত্মীয়দের 'বাগানের বোঝা' হিসেবে অভিহিত করছেন। আসলে কর্মরত নির্ভরশীল যারা থাকতো তারা ছিল শিশুরা, অক্ষম মানুষ আর শ্রমিকের বুড়ো বাপ-মা, যারা এই বাগানেরই শ্রমিক ছিল। এদের এখনও পর্যন্ত কোন প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অথবা অবসর গ্রহণের পর বাঁচবার মত কোন উপায়ই ছিল না। এই অবস্থাতে কর্মরত শ্রমিকদের সন্তান সন্ততিদের সঙ্গে তাদেরও স্বল্পমূল্যে রেশন সরবরাহ করা মালিকদের নৈতিক ও

মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এইটুকুও চা মালিকরা তাদের অতীতের কর্মরত শ্রমিকদের দিতে রাজী ছিল না।

একদিকে যেমন শ্রমিক ছাঁটাই এবং তথাকথিত বাড়তি শ্রমিকদের অন্য বাগানে বদলির কথা হচ্ছে তখন ঠিক একই সময় অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ সালে মরশুমের সময় ও আসাম ও ডুয়ার্সের শ্রমিক আমদানির জন্য মালিকদের সংগঠন টি ডিস্ট্রিক্ট লেবার (টি ডি এল) অ্যাসোসিয়েশনকে শ্রমিক পিছু ২৫ টাকা কমিশন দিতে হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে আসামে শ্রমিক সংগ্রহের চার্জ হিসেবে প্রতি দুজন শ্রমিকের জন্য ২৯০ টাকা করে এবং উপরন্তু জন প্রতি আরো ১০০ টাকা করে দিতে হয়েছে।

ডুয়ার্সে এই চার্জ হিসাবে টি ডি এলকে দিতে হতো—যথাক্রমে ১৮৫ টাকা ও ৭০ টাকা। যখন আজকের দিনেও শ্রমিক সংগ্রহের জন্য এত টাকা দিতে হচ্ছে তখন, মালিকদের বক্তব্য যে চা বাগানে শ্রমিক বাড়তি আছে এটা কেউ বিশ্বাস করবেন না।

এছাড়া মোটা মাইনার অফিসাররা থাকবে অথচ স্বল্প মাইনের কর্মচারীরা (করণীক) ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছেন, এটা কখনও বরদাস্ত করা যায় না।

বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

যেহেতু এটা পাতা তোলার মরশুম নয়, আর এই সময় পাতা তুলে নগদ টাকা তোলা সম্ভব নয় তাই এই সময়টা অর্থাৎ শীতকালে চা মালিকরা বাগান বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ উপবাসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। চা শিল্পের শ্রমিকদের অত্যন্ত স্বল্প মাইনে থেকে এক পয়সাও দু'দিনের জন্য রাখার উপায় ছিল না। তাদের কর্জ নেবারও কোনও রাস্তা ছিল না। এই বন্ধ কারখানায় শ্রমিকদের ১৯৫১ সালের শেষের থেকে অনাহারে মৃত্যুর খবর আসছিল। বিশেষ করে ত্রিপুরার বন্ধ বাগানগুলো থেকে।

এ সময়ই ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে বন্ধ বাগানগুলো পরিচালনার দায়িত্ব নেবার দাবি জানান হয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এও দাবি করা হয়েছিল যে যত দিন পর্যন্ত না এই যৌথ পরিচালনা ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বন্ধ চা বাগান খুলে শ্রমিকদের প্রাণধারণের জন্য মজুরীর দুই তৃতীয়াংশ দেওযা চালু থাকুক। সরকার ইতিমধ্যে মালিকদের কিছু কিছু সুবিধা দিতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাংক মারফত ঋণ দানের আরো সুবিধাজনক সর্তের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দার্জিলিং-এর কযেকটি বাগানে মালিকদের নিজেদের গোলমালের জন্য বাগান বন্ধ করে দিযে হাজার হাজার শ্রমিককে অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

সেই সব বাগানগুলো সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় এবং এই দাবির স্বপক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া যে সব বাগান এখনও বন্ধ হয়নি, বিশেষ করে দার্জিলিং, আসামের কাছাড় জেলা এবং ত্রিপুরা—সে সব জায়গায় তিন দিন বা চার দিন কাজ দেওয়া হচ্ছিল। এ ভাবে শ্রমিকদের বাধ্য করা হচ্ছিল আংশিক বেকারী মেনে নিতে। এই আংশিক বেকারত্বের জন্য কোন ভাতা দেওয়া হতো না। এমনকি এই কয়দিনের জন্য স্বল্প মূল্যে যা রেশন দেওয়া প্রচলিত ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এ সবই করা হচ্ছিল 'চা শিল্পে সংকট'-এর নামে এবং শ্রমিক-দের বেতন কেটে এবং অনাহারে রেখে উৎপাদন খরচ কমাবার জন্য।

মালিকরা ১৯৫১ সালের শেষ থেকেই 'চা শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে' এই আওয়াজ তুলতে সুরু করেছিল। এই আওয়াজের

মুখপাত্র ছিল ইংরাজ কোম্পানিগুলি যারা চা শিল্প থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে বিদেশে পাঠিয়েছে, যাদের 'ডিভিডেন্ট প্রদানে কোন বছরেই, ঘাটতি হয়নি' এমনকি ১৯৫০

১৯৫০ সালে কয়েকটি চা কোম্পানীর মূলধন, লাভ ইত্যাদি
(পাউণ্ড স্টার্লিং-এর হিসাবে)

কোম্পানীর নাম	মূলধন	লাভ	এক পাউণ্ড চা-তে লাভ	অর্ডিনারী শেয়ারে ডিভিডেণ্ডের হার
১। আসাম ডুয়ার্স	২,৬৫,০০০	২,৭৫,০০০	৭·৮৯ পেন্স (৭ আনা)	১২০%
২। বোরেলি (আসাম)	৮৫,৮৪০	১,২০,৫৫৫	১১·৬ পেন্স (৯ আনা ৫ পাই)	১৩১%
৩। ডেঙ্গুয়াঝাড় (পশ্চিম ডুয়ার্স)	৫০,০০০	৪৯,৯৯৯	৯·৮৭ পেন্স (৮ আনা ৯ পাই)	১০৭·২%
৪। মাকুম (আসাম)	১,১১,০০১	১,৭৫,৩৬৫	১২·৫০ পেন্স (১১ আনা ১½ পাই)	১৩০·৬%
৫। রাজনী (আসাম)	৮৪,০০০	৯০,০০০	১০·৪৭ পেন্স (৯ আনা ৩¾ পাই)	১২৫%

(টাকার হিসাবে)

কোম্পানীর নাম	মূলধন	লাভ	এক পাউণ্ড চা-তে লাভ	অর্ডিনারী শেয়ারে ডিভিডেণ্ডের হার
৬। বানার হাট (ডুয়ার্স)	১৫,০০,০০০	১৮,২০,৮৫৬	৮ আনা ৭ পাই	৫০%
৭। বড়দীঘী ঐ	৬,০০,০০০	৭,২৮,৫৭০	৬ আনা ১০ পাই	৫০%
৮। রায়ডক ঐ	৭,৪৬,৪০০	১১,৩৭,৫৪৭	৮ আনা ৪ পাই	৭০%
৯। পাহার ঘুমিয়া (তরাই)	৩,৯০,০০০	৫,১৩,৭৩৯	৮ আনা	৩৮% (১৯৪৯)
১০। পীর মাদে (দক্ষিণ ভারত)	৮,৫০,০০০	৯,৪৭,৭৮৪	৮ আনা ৮ পাই	৭৫%

[বিঃ দ্রঃ ঐ সময়ে পাতা তোলার মজুরীর হার ছিলো প্রতি পাউণ্ড চায়ে ৬ পাই থেকে ৯ পাই এবং প্রতি পাউণ্ড চায়ে মোট মজুরী ব্যয় ছিলো চার আনা।]

সালেও বহু স্টার্লিং কোম্পানীর মুনাফা হয়েছিল নিয়োজিত পুঁজির ১০০ ভাগ-এরও বেশী। ১৯৫০ সালে একপাউণ্ড চায়ের দরুন এদের নেট মুনাফা হতো আট আনা থেকে বারো আনা। পাতি তোলার জন্য শ্রমিকরা পাচ্ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই থেকে ৯ পাই। এ ছাড়া আর ১ আনা অথবা আর একটু বেশী মহার্ঘ-ভাতার সাথে সস্তাদরে চাল এবং থাকার জন্য পাউণ্ড প্রতি মালিকরা একটু বেশী খরচ করতো।

কয়েকটি বাগানের ১৯৫০ সালের মূলধন, নীট লাভ ইত্যাদি আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। আর তার নীচে শ্রমিকদের যে একেবারে আধা দাসের মত রাখা হতো তা তাদের প্রদত্ত নযা বেতনের বহর দেখলে বোঝা যাবে।

১৯৫১ সালে উত্তর ভারতের একজন চা শ্রমিকের ডুয়ার্স, তরাই, দার্জিলিং ও আসামে মাসিক নগদ আয় ছিল ১৭৫০ (সতের টাকা আট আনা) থেকে ২৮·৬২ পযসা (আঠাশ টাকা দশ আনা)। আর শিশু শ্রমিকদের আয় ছিল দশ টাকা থেকে সাড়ে ১২ টাকার মধ্যে। এই আয় ছিল ন্যূনতম বেতন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আর এটা মিঃ দেশপাণ্ডের সুপারিশের চেয়েও আরো কম। এখানে মিঃ দেশপাণ্ডে যখন ন্যূনতম বেতনের সুপারিশ করে ছিলেন তখন কেবল মাত্র শ্রমিকদের খাদ্যে একটু উন্নতির কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন।

দেশপাণ্ডে তার রিপোর্টে দেখিয়েছেন যে চা শ্রমিক পরিবার তার আয়ের শতকরা ৭৭·৪২ ভাগ খাদ্যের জন্য খরচ করে এবং সেই খাদ্য একমাত্র চাল আর নূন ছাড়া বিশেষ কিছু জুটতো না। এই ন্যূনতম বেতন অনুযায়ী শ্রমিকদের মহার্ঘভাতাই মাত্র বাড়ানো হয়েছিল, বেতন বাড়ানো হয়নি।

এর পরেও মালিকরা দাবি করছিল সস্তা দরে রেশন বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের অর্ধ উপবাসের মুখে ঠেলে দিতে। শেষ পর্যন্ত

অবশ্য ওরা রেশনের দাম বাড়িয়ে এবং পরিমান কমিয়ে দিতে সফল হয়েছিল। আর এটা সম্ভব হয়েছিল সরকারের মালিকদের পক্ষে ওকালতি করা এবং পক্ষপাতিত্বের ফলে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অবশ্যই তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু তাতে তখন কোন ফল হয় নি। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে চা শিল্পে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার পটভূমি হলো উপরে লিখিত অবস্থা।

১৯৫৩ সালের ১২ই জানুয়ারী বি পি টি ইউ সি-র উদ্যোগে বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং গণসংগঠনগুলির এক সভায় ছাঁটাই বিরোধী সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় ৮০টি বিভিন্ন শিল্প এবং কারখানার ইউনিয়ন, মহিলাদের, যুবকদের এবং কৃষকদের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভা ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ এক ব্যাপক রূপ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

বন্ধ বাগান চালু করার জন্য, বেতন কাটার প্রতিবাদে, বেকার ভাতার দাবীতে, প্রতি এলাকায় সমস্ত ইউনিয়ন ও গণসংগঠনগুলির মিলিত সভা, সমাবেশ, গণ দরখাস্ত, ডেপুটেশন, শোভাযাত্রা ও ভুখা মিছিলের মারফত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এটাই ছিল সিদ্ধান্ত। চা শ্রমিকদের আন্দোলনও এই যুক্ত আন্দোলনের অংশ হিসাবে এগিয়ে যায়। একমাত্র ১৯৫২ সালের মধ্যেই ভারতের চা বাগানের ভিতর ১২০টি বাগান হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, না হয় বন্ধ করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন "সত্যযুগ" ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫৩ সালের সংখ্যা অনুযায়ী ঐ বাগানগুলির সবই ছিল আসাম ভ্যালি, সুরমা ভ্যালি, দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স ও ত্রিপুরায়। এই ১২টি বাগান বন্ধ হওয়ার ফলে অন্ততঃ এক লক্ষ চা শ্রমিক সম্পূর্ণ বেকার এবং দুস্থে পরিণত হয়েছিল। এদের পরিবার ও পোষ্যের সংখ্যা ধরলে মোট প্রায়

চারলক্ষ লোক অনাহারের সম্মুখীন হয়েছিল। এইসব বাগান-গুলির কর্মচারী, ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যাও তাদের পোষ্যসহ হবে বারো হাজারের উপর। এছাড়া বাগানগুলির উপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ী, কণ্ট্রাক্টর প্রভৃতি, যাদের জীবিকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বাগানের ওপর তাদের সংখ্যাও পোষ্যসহ প্রায় দেড় হাজার হবে। কাজেই এই বাগানগুলি বন্ধ হবার ফলে শুধু যে শ্রমিক কর্মচারীরাই বেকার হয়েছিল তাই নয়, দোকানদার ব্যবসায়ীরাও এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সবশুদ্ধ মোট প্রায় চার লক্ষ লোকের জীবনে এক অনাহারের বিভীষিকা এনে দিয়েছিল।

এই বিষয়ে মনোরঞ্জন রায় মতামত কাগজে ১৯৫৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী সংখ্যায় "চা শ্রমিকদের বেকারী সমস্ত জাতিকেই আঘাত করছে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন।

চা শ্রমিকদের বেতন ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম বেতন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার সময় শ্রমিকদের সস্তা দরে রেশন সরবরাহ করাকে বেতনেরই একটা অংশ হিসাবে ধরা হয়েছিল। ডুয়ার্স, তরাই ও আসামে রেশন সরবরাহ করা হত পাঁচ টাকা মন দরে, আর দার্জিলিংএ এই দর ছিল মণ প্রতি আট টাকা।

১৯৫২ সালে এই রেশনের দাম আট টাকা থেকে বাড়িয়ে মণ প্রতি করা হল সাড়ে নয় টাকা, আর পরিমানটাও এই সঙ্গে কমিয়ে দেওয়া হল। রেশনের দাম বাড়ানো এবং পরিমান কমানোর ফলে শ্রমিকের মূল বেতন শতকরা ২৫ ভাগ কমে গেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডুয়ার্স ও তরাইএর শ্রমিকদের বেতনও কমিয়ে দিলেন। এছাড়া, '৫২ সালে পাত্তির মরশুম শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব বাগান তখনও চালু ছিল সেখানে তখনও তিন থেকে পাঁচ দিনের বেশী কাজ করাত না। অর্থাৎ নগদ বেতনও অর্ধেক হয়ে গেল।

মনোরঞ্জন রায়ের ঐ রচনা থেকে দেখা যায় চা শ্রমিকদের

বেকারী ও বেতন কাটার ফলে সারা দেশে প্রায় এক কোটি মানুষের ওপর এর আঘাত এসে পড়ল। আসাম, ডুয়ার্স, তরাই এবং দার্জিলিং এর সমস্ত অর্থনীতি নির্ভর করত চা শিল্পের উপর। এই সংকটের ফলে চা শিল্প এলাকার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

ঐ একই সময় কাপড় কলের শ্রমিকদের মধ্যেও ব্যাপক ছাটাই শুরু হয়। ১৯৫২ সালের অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এই তিনমাসে পশ্চিমবঙ্গে ছয় হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়, অথবা ছাঁটাই এর নোটিশ পায়। সস্তা দামের ক্যানভাসের জুতা চা-শ্রমিক পরিবারের লোকরাই বেশী ব্যবহার করত, এছাড়া রাবারের জুতোও চা-বাগানের শ্রমিকরাই বেশী ব্যবহার করত। কৃষিক্ষেত্রে এবং চা বাগানে সংকটের ফলে এইসব সস্তা দামের জুতা বিক্রী অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এর ফলশ্রুতিতে বাটা কোম্পানী শ্রমিকদের সপ্তাহে কাজের দিন ও ঘণ্টা কমিয়ে উৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে ওখানকার নয় হাজার শ্রমিক কর্মচারীর বেতন কমে যায় এবং এর সংগে জড়িত চল্লিশ হাজার লোকের আয় কমে যায়। ক্যানভাসের জুতোর ক্যানভাসটা তৈরী হত ডানবার সুতো কলে। বাটা কোম্পানী ক্যানভাসের জুতো উৎপাদন কমিয়ে দেবার ফলে ১৯৫৩ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে ডানবারের ১১০০ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যায়। ডানলপ কোম্পানী বাটার রবারের জুতোর রবার সরবরাহ করত। বাটা সেই রবার ডানলপ থেকে আনা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ডানলপের শ্রমিকদের, উৎপাদন কমে যাওয়ার নাম করে বেতন কাটা হল। ডানবার, ডানলপ বা বাটার শ্রমিকদের ওপর আঘাত আসার কারণ সাধারণভাবে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া ঠিকই, কিন্তু চা শ্রমিক কর্মচারীদের বেকারী যে এই সংকটকে আরো দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে দিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাজেই চা শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীর ওপর যে আঘাত আসছিল তার ফলশ্রুতি শুধু চা এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে নি, সমস্ত শিল্প, সমস্ত জাতিকেই এই গভীর সংকটের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। চা শিল্পের সংকট তাই জাতীয় সংকট।

ভারত সরকার এই সংকটের সমস্ত বোঝা সেদিন মজুর ও গরীব কর্মচারীর ওপর চাপাতে চেয়েছিল। সরকার মালিকদের হয়ে শ্রমিকদের হুমকি দিয়েছিল—"হয় বেতন কাটা মেনে নাও, নয় বাগান বন্ধ হয়ে যাবে।" অথচ সেই সময়ও এই শিল্পের ইংরেজ মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করত, ম্যানেজাররা বছরে ৮০-৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত কামাত, ম্যানেজিং এজেন্সিগুলো বছরে কমিশন ও খরচ বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা নিত। সেদিকে সরকারের কোন নজর ছিল না, নজর ছিল কেবল শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন কাটার উপর। সেই দিনও ইংরেজ বাগানের অতি মুনাফার পরিমাণ সীমাবদ্ধ করার জন্য আইন করা তো দূরের কথা, প্রতি বছর যে মুনাফা তারা সেই সময় বিলাতে চালান দিত তাও সাময়িকভাবে বন্ধ করতে সরকার রাজী ছিল না। অন্যদিকে সরকার এই শিল্প থেকে প্রতি বছর যে ১৫ কোটি টাকা শুল্ক ও ট্যাক্স বাবদ আদায় করত তাও শ্রমিক-কর্মচারীর এই সংকটের সময় অন্ততঃ কিছুটা ফিরিয়ে দিতে রাজী ছিল না। সরকারের এই শ্রমিকবিরোধী নীতিই সেদিন ইংরেজ মালিকদের সুযোগ করে দিয়েছিল কোটি লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরের ত্রিদলীয় সম্মেলনে এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস প্রভৃতি সংগঠনগুলি চা-মালিকদের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব পেশ করে মালিক ও সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করতে পেরেছিল, সেই ঐক্যই পরবর্তীকালে চা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠার ইঙ্গিত ছিল।

এটা ঠিক যে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত

ত্রিদলীয় সম্মেলনে আই এন টি ইউ সি-সহ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি মিলিতভাবে চা মালিকদের এবং সরকারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঐক্যমত হয়েছিল এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে একটিমাত্র প্রস্তাব পেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সম্মেলনের বাইরে গিয়ে শ্রমিক সাধারণকে এই ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করানো যায়নি, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের ওপর নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য অন্য ইউনিয়নগুলোর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পরস্পর বিরোধীতা সমগ্র '৫৩ সাল ধরেই চলে। এই অবস্থায় চা শ্রমিকরা স্বভাবতই খুব অসহায় বোধ করছিল। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যের জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ছিল, কিন্তু সেটা নিজ নিজ সংগঠনের নেতৃত্বের সামনে তুলে ধরবার মত সাহস তাদের ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সহজ, কিন্তু ঐক্য গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ, কারণ মালিকরা সব সময়ই চেষ্টা করে যাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় এবং ঐক্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে। আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস প্রভৃতি সংগঠনের জন্মই হয়েছিল বিভেদের মধ্য থেকে এবং গড়ে উঠেছিল মালিকদের সহায়তায় এটা অবশ্য আমরা আগেই বলেছি। চা বাগানের ক্ষেত্রেও আই এন টি ইউ সি, এইচ এম এস প্রভৃতি একই রকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আসামে এ আই টি ইউ সি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। আসামের শিল্প বলতে চা শিল্প, রেল এবং ডিগবয়ের তৈলখনি ছাড়া আর বিশেষ কোন শিল্প ছিল না ; আর চা শিল্পের প্রয়োজনে সামান্য প্লাইউড শিল্প গড়ে উঠেছিল। রেলের শ্রমিকদের মধ্যে ১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্বে রেল শ্রমিকদের একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল। ১৯৪৮ সালের হঠকারি আন্দোলনের ফলে সেই সংগঠন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এ আই টি ইউ সি-র চা-বাগানেও যা কিছু

ছিল, ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হবার পর সেটাও নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থায় চা শ্রমিকদের আন্দোলনে আই এন টি ইউ সি, যারা ছিল চা শ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সংগঠন, তাদের কাছে আবেদন নিবেদন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নিয়ে আসা কখনো সম্ভব ছিল না, আর হয়ও নি। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে মালিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনের অনুভূতি থাকলেও তাদের নেতৃত্বের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলার মত সাহস তাদের ছিল না। তার কারণ এ আই টি ইউ সি, যারা ঐক্যের কথা বলেছিল, তাদের শক্তি ছিল অত্যন্ত কম। তাছাড়া, যখন চা-মালিকরা সঙ্কটের কথা প্রচার করছে এবং সরকারও সেই প্রচারে সায় দিচ্ছে, তখন এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পদ্ধতি কি হবে সেই সম্পর্কে শ্রমিকদের সঠিক ধারণা ছিল না। আরও বিশেষ করে এই আক্রমণটা শুরু হয় পাতি তোলার সময় উত্তীর্ণ হবার পর, অর্থাৎ শীতের সময়। ওই সময়টায় ধর্মঘট করার অর্থ মালিকদের সাহায্য করা, কারণ পাতি তোলার পর আর বিশেষ কোন কাজ থাকে না। থাকলেও মালিকরা সেটা না করিয়ে চালিয়ে যেতে পারতো।

১৯৫১ সালে ন্যূনতম আইন অনুযায়ী ন্যূনতম আইনের উপদেষ্টা কমিটি দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের জন্য নিম্নরূপ বেতন ধার্য করে :

দার্জিলিং	মূল বেতন	মহার্ঘভাতা	মোট
পুরুষ	০˙৫০	০˙৪৪	০˙৯৪
মহিলা	০˙৪৪	০˙৪৪	০˙৮৮
শিশু	০˙২৫	০˙২৫	০˙৫০
ডুয়ার্স ও তরাই :			
পুরুষ	০˙৭৫	০˙৪৪	১˙˙৯
মহিলা	০˙৬২	০˙৪৪	১˙০৬
শিশু	০˙৩৭	০˙২৫	০˙৬২

এই সময় রেশন সস্তা দামে মালিক কর্তৃক সরবরাহ করা হত। ডুয়ার্স ও তরাই-এ এক মণ চালের দাম নেওয়া হত পাঁচ টাকা এবং দার্জিলিঙে মণ প্রতি নেওয়া হত সাড়ে সাত টাকা। ১৯৫২ সালের তথাকথিত সংকটের পূর্ব পর্যন্তও চা বাগানের প্রত্যেকটি পরিবারের সকল পুরুষ, মহিলা ও শিশুদেরই কাজ দেওয়া হত এবং সমস্ত পরিবারের আয়ের ভিত্তিতেই ন্যূনতম বেতন কমিটিও পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের বেতন ধার্য করেছিল।

১৯৫১ সালে চায়ের মূল্য পড়ে যাওয়ার ফলে অথবা ইচ্ছাকৃত-ভাবে কমিয়ে দেবার ফলে বাগানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই রেশনের দাম বাড়িয়ে দেবার ফলে শ্রমিকদের অবস্থা কি হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও তারা কিভাবে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল তার কিছু উদাহরণ আমরা একটি রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই।

শ্রমিকদের প্রতিরোধ

দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চল

দার্জিলিং-এর পাহাড় অঞ্চলে ১.১.৫৩ তারিখের পরও অর্থাৎ ত্রি-দলীয় সম্মেলনের পরও ভারতীয় এবং ইউরোপীয় কয়েকটি বাগানে সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ দেওয়া হচ্ছিল। এর মধ্যে ইংরেজ ও কয়েকটি ভারতীয় বাগানের নাম বলা যায় যেখানে পাঁচ দিন বা তার কম কাজ দেওয়া হচ্ছিল। বেনেকবার্ন চা বাগান, সিংতাম, পেশক, চুং টুং, লিজাহিল, বার্ণসবেস, এভেনগ্রোভ (ম্যালট) এ রকম আরো অনেক বাগানেই তখন পাঁচদিন কাজ দেওয়া হত।

কয়েকটি বাগানে অবশ্য তখনও নামে মাত্র সপ্তাহে ছয়দিন কাজ দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু কাজের ঠিকা এত বেশী করে দেওয়া

হয়েছিল যে সেই ঠিকা শেষ করতে তাদের এক সপ্তাহ লেগে যেত, কিন্তু বেতন পেত মাত্র তিন দিনের। এইসব বাগানগুলো ছিল ঋষির হাট চা বাগান, বাদাম তাম প্রভৃতি। আবার রংমুখ, সিডার চা বাগানে পুরুষদের দশ আনা, মহিলাদের আট আনা ও শিশুদের দৈনিক পাঁচ আনা মজুরী দেওয়া হত, অবশ্য সপ্তাহে ছয়দিনই তাদের কাজ দেওয়া হত।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে চা বাগানের মালিকরা যখন রেশনের দাম বাড়াবার কথা ঘোষণা করে এবং সেই মর্মে সম্মত আছে বলে শ্রমিকদের কাছ থেকে টিপ-সই জবরদস্তি করে আদায় করতে থাকে, তার বিরুদ্ধে প্রায় সব বাগানেই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। এই জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ফলে বার্ণসবেস বাগানে ২২. ১. ৫৩ তারিখে ছয়জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। রন্মুখ, সিডার বাগানে ম্যানেজার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের নেতা করণকজ ছেত্রীর ঘর ভেঙ্গে দেবার হুকুম দেয় এবং তার বুকের সামনে বেয়নেট উঁচিয়ে তাকে ভীতি প্রদর্শন করে।

তারই সঙ্গে ওই সময়ে যেসব বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে ছিল—সিংতাম চা বাগান, ব্লুমফিল্ড, পাংদাম, মিনারেলস্প্রিং, সিঙ্গল, নরবুম, মানেতার, মালুতার ও সিবেতার চা বাগান। এই সব বন্ধ চা বাগানগুলির বেকার শ্রমিকদের কোন ত্রাণ ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় নি। ফলে নরবুম, মানেতার ও সিংতাম চা বাগানের কয়েকজন শ্রমিকের অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়।

দার্জিলিঙের চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরী শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়ে দেবার পর ডুয়ার্স ও তরাই-এর শ্রমিকদের মজুরী কাটা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে ডুয়ার্স ও তরাই-এর কোন বাগানেই সপ্তাহে চার-পাঁচ দিনের বেশী কাজ দেওয়া হচ্ছিল

না। অধিকাংশ বাগানেই এক টাকা তিন আনা মজুরী কমিয়ে ১১ আনা থেকে ১৩ আনায় নামিয়ে আনে, যার অর্থ হল সপ্তাহে প্রায় দুই টাকা বা প্রায় ৩৩% বেতন কমে গেল। ইংরেজ মালিকানাধীন বাগানগুলিতে রেশনের দাম মণ প্রতি পাঁচ টাকা থেকে বাড়িয়ে সতের টাকা করা হয়। অন্যথায় কম মজুরীতে সপ্তাহে চার দিন কাজ দেওয়া হয়।

ডুয়ার্স ও তরাই-এর বাগানগুলিতে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই, বাগান বন্ধ করে দেওয়া, মাসের পর মাস মজুরী না দেওয়া, কর্মচারীদের বেতন দশভাগ থেকে পঁচিশ ভাগ কমিয়ে দেওয়া, তাদের মাসিক বেতন কম করে দেওয়া, জবরদস্তি শ্রমিকদের বাগান থেকে উৎখাত করা—এ সবই তখন ডুয়ার্স ও তরাই-র চা বাগানে চলছিল তথাকথিত সংকটের নামে। এখানে কয়েকটি চা বাগানের তখনকার দিনের অবস্থা তুলে ধরা হল :—

ডুয়ার্সের চা বাগান : যাদবপুর চা বাগান—কর্মচারীরা তিন মাস ধরে আর শ্রমিকরা দেড় মাস ধরে বেতন পায়নি। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাস থেকে শ্রমিকরা দৈনিক ৭ আনা হারে বেতন পেয়েছে ; কাউকেই কোন মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়নি, এরপর কোন বেতন দেওয়াই বন্ধ করে দেওয়া হল। এই অবস্থায় শ্রমিকরা ১৯৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী থেকে কাজ বন্ধ করে দিল। এই বাগানের আড়াইশো বেকার শ্রমিক কাছাকাছি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু, জ্বালানী কাঠ কেনবার লোক কোথায় ? সবারইতো আর্থিক অবস্থা সমান। বাগানের ওপর নির্ভরশীল দোকানদার ও অন্যান্যদের অবস্থাও কাহিল। কাজেই জ্বালানী বিক্রি করে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ।

দেবপাড়া চা বাগান—সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ, দৈনিক মজুরী তের আনা হিসাবে ; সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপও প্রচণ্ড বাড়িয়ে

দিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে মালিকরা সেটি কমাতে বাধ্য হয়।

ইংরেজ বাগান চ্যাংমাড়ী—সপ্তাহে মাত্র চারদিন কাজ দেওয়া হচ্ছিল। এখানে দিনে আট ঘণ্টা কাজের ভিত্তিতে বেতন ধার্য করা হয়েছিল। আট ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ তার কাজ শেষ করতে না পারে, তবে দৈনিক বেতন মাত্র এগার আনা দেবার প্রথা চালু হয়। এই চা বাগানেই প্রথম আট ঘণ্টা কাজের ভিত্তিতে পিসরেট প্রথা চালু হয়। কোন বাগানেই তখন ৫ ঘণ্টার বেশী কাজ চালু ছিল না। বাগানের অন্য সব কর্মচারীদের বেতন শতকরা দশ ভাগ হ্রাস করা হল, ছুটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাসিক বেতন-ভোগী শ্রমিক, যথা—চৌকিদার, দফাদার, মোটর ড্রাইভার, মিস্ত্রী, ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিক, এদের বেতনকে দৈনিক হিসাবে ভাগ করে সপ্তাহে চার দিনের মজুরী দেওয়া হচ্ছিল। এর ওপর, সাড়ে সতের টাকা মণ দরে চাল কেনার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য মালিক চাপ সৃষ্টি করছিল। কিন্তু কোন শ্রমিকই এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজী হয় নি।

আর একটি ইংরেজ বাগান লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা সপ্তাহে চার দিনের কাজ চালু করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং প্রতিরোধ করার ফলে শেষ পর্যন্ত পাঁচ দিন কাজ চালু করেছিল। তার ওপর ইংরেজ ম্যানেজার সাড়ে সতের টাকা মণ দরে চাল কেনার জন্য অনবরত চাপ দিতে থাকে। ক্রিশ্চান মিশনারীরা তাদের খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বি সর্দারদের ওপর চাপ দিয়ে সাড়ে সতের টাকা দরের চাল কিনতে রাজী করাতে পেরেছিল। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা এক বাক্যে এই প্রস্তাব নাকচ করায় মালিকদের পক্ষে এটা চালু করা সম্ভব হয় নি। এই বাগানে দৈনিক তের আনা হিসাবে পাঁচ দিন এক হাজিরার কাজ দেওয়া হচ্ছিল।

ওদলাবাড়ী—আর একটি ইংরেজ বাগান। এই বাগানের ১৭৮ জন শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের রেশন দেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বাকী শ্রমিকদের সপ্তাহে পাঁচ দিন দৈনিক এগার আনা মজুরীতে কাজ দেওয়া হচ্ছিল।

ডুয়ার্সেরই আর একটি ইংরেজ বাগান মালনদী—এগার আনা দৈনিক হিসাবে সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ দেওয়া হচ্ছিল। শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ফলে বাগানে পুলিশ এসে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে হুমকি দিতে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অসুস্থ শ্রমিকদের জন্য দিনে ছয় আনা অসুস্থ হাজিরা চালু ছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালে সমস্ত বাগানেই অসুস্থ হাজিরা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া কাজের দিন হিসেবে সস্তা দরে রেশন দেওয়া হত, তার মধ্যে সরষের তেল, গুড় ইত্যাদিও কম দামে দেওয়া হত। কিন্তু সংকটের অজুহাতে এগুলিও বাজার দরে দেওয়া শুরু হল, অর্থাৎ এগুলোর দাম বাড়িয়ে দেওয়া হল।

১৯৪২ সালের শেষ দিক থেকে তরাই-এর দাগাপুর চা বাগানে অন্য সব বাগানের মতই দিনে এগার আনা মজুরী হিসাবে পাঁচ দিনের কাজ দেওয়া হচ্ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন এ আই টি ইউ সি ইউনিয়নের সভ্য হবার অপরাধে ম্যানেজার তিনটি পরিবারের সমস্ত নারী পুরুষ ও শিশুকে বল প্রয়োগ করে বাগান থেকে বহিষ্কার করে দেয়। অর্থাৎ 'হট বাহার' করে দেওয়া হয়। তাদের নেতা জুনাস মুণ্ডা ও তার পরিবারবর্গকে গুণ্ডা দিয়ে মাঝরাতে উৎখাত করে তার কুঁড়েঘর মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। এই অত্যাচারের কথা লেবার কমিশনারের দপ্তরে নালিশ হিসাবে রুজু করা হয়, কিন্তু তার কোন প্রতিকারই হোল না।

ডুয়ার্স ও তরাই-এর চা বাগানের সমস্ত মালিকরাই, বিশেষ

করে ইংরেজ মালিকরা মজুরদের দিয়ে মণ প্রতি চালের দাম পাঁচ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে সতের টাকা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু সর্বত্রই প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে মালিকরা এই বে-আইনি দাবি কার্যকরি করতে ব্যর্থ হল। তাই শেষ পর্যন্ত সরকার ন্যূনতম মজুরী আইন অনুযায়ী চালের দাম বাড়ানোর অনুমোদন নেবার জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণকারী উপদেষ্টা কমিটির মিটিং ডাকেন ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

এই মিটিং-এর ঠিক দুদিন পূর্বে জার্ডিন হেণ্ডারসন কোম্পানীর ডুয়ার্সের বড়দিঘী চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে জোর করে সাড়ে সতের টাকা মণ দরের চাল বিক্রি করার চেষ্টা হয়। শ্রমিকরা এই দামে চাল কিনতে অস্বীকার করলে এবং এর প্রতিবাদ করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গুলি চালিয়ে একজন শ্রমিককে নিহত ও তিনজন শ্রমিককে আহত করে। বাগানের ভিতর পুলিশ আগে থেকেই এনে রাখা হয়েছিল এবং এই গুলি চালনাটি ছিল ইংরেজ মালিক এবং কংগ্রেস সরকারের একটি পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যাতে শ্রমিকরা আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে বর্ধিত মূল্যে চাল নিতে স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ন্যূনতম মজুরী উপদেষ্টা কমিটির সভ্যরাও বর্ধিত হারে চালের দাম নির্ধারণ করতে স্বীকার করে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জার্ডিন হেণ্ডারসনের ডুয়ার্সের বড়দিঘী বাগানের নীট মুনাফা (কর বাদ দিয়ে) ১৯৫০ সালে ছিল পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার চারশ নিরানব্বই টাকা, আর মোট পুঁজি ছিল তার চেয়েও কম মাত্র পাঁচ লক্ষ তিন শ একাত্তর টাকা। অর্থাৎ পঞ্চাশ সালেও তাদের নীট মুনাফা শতকরা একশ ভাগের বেশী হয়েছিল। আর এই বাগানটিকেই সরকার গুলি চালিয়ে শ্রমিক হত্যার জন্য বেছে নেয়, এটাই ছিল বেতন নির্ধারণ উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের পশ্চাদপট।

ডুয়ার্স ও তরাই-এর চা শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণের উপদেষ্টা কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি ছিলেন ৬ জন—আই এন টি ইউ সি-র ৩ জন, এইচ এম এস-এর ২ জন এবং এ আই টি ইউ সি-র মাত্র ১ জন।

বৈঠকে রেশনের দাম বৃদ্ধির যে প্রস্তাব আসে তা হলো—(১) সরষের তেল, গুড় প্রভৃতি আর সস্তাদরে দেওয়া হবে না, শ্রমিকদের এগুলি বাজার থেকেই কিনতে হবে, (২) চালের দাম পাঁচ টাকার পরিবর্তে পনের টাকা মণ দরে মালিকদের কাছ থেকে কিনতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু চা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করবার সময় মোদক কমিটির সুপারিশ মতো সস্তাদরে চাল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করবার জন্য মালিকরা প্রতিশ্রুত ছিল, তাই তখন নগদ বেতন কম করে ধার্য করা হয়েছিল।

মালিকরা যে রেশনের দাম বাড়াবার প্রস্তাব দেয় তা সরকারী প্রতিনিধিরা সমর্থন করে, তার সঙ্গে আই এন টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-এর প্রতিনিধিরাও সমর্থন জানায়। একমাত্র এ আই টি ইউ সি-র প্রতিনিধি সুবোধ সেন বেতন কমিটিতে রেশনের দাম বাড়িয়ে বেতন কাটার প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করে, তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে চা মালিকরা ১৯৫০ সালেও কি প্রভূত পরিমাণ মুনাফা লাভ করেছে তার হিসেব দিয়ে এই রকম বেতন কাটার কোন কারণই থাকতে পারে না বলে জোর দিয়ে বলেন।

রেশনের দাম বাড়িয়ে বেতন হ্রাস করবার যুক্তি হিসাবে মালিকরা চায়ের দাম ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এই অজুহাত তোলেন। আই এন টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-এর প্রতিনিধিরা মালিকদের চায়ের মূল্য হ্রাসের তথ্য স্বীকার করে নেন। কিন্তু সুবোধ সেন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৫৩ সালের

ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কলকাতার নীলাম বাজারে চায়ের দাম যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তারই একটি হিসেব সভায় দাখিল করেন। তা নিচে দেওয়া হল।

গড় পড়তা প্রাপ্ত দাম

তারিখ	বিক্রী নম্বর	উত্তর ভারত টাকা আনা পাই	ডুয়ার্স	তরাই	দার্জিলিং	ত্রিপুরা
৮.১২.৫২	২৭	০-১৫-১১	০-১৩-৩	০-১৩-৩	১-৬-১	০-১১-৬
১৫.১২.৫২	২৮	১-০-১	০-১৪-৫	০-১৪-১০	১-৮-১০	
৫.১.৫৩	২৯	১-৩-৮	১-১-৪	১-৪-৯	১-৯-১১	০-১৩-১
১২.১.৫৩	৩০	১-৪-৬	১-১-৫	১-২-২	১-১৫-৫	
১৯.১.৫৩	৩১	১-৪-১১	১-২-০	১-১-১০	১-১৫-০	০-১৩-১০
২৭.১.৫৩	৩২	১-৫-৬	১-২-৩	১-১-১০	২-১-২	১-০-৮
২.২.৫৩	৩৩	১-৫-১০	১-২-৭	১-২-১১	১-১৪-১	১-০-৪
৯.২.৫৩	৩৪		১-৩-১	১-৩-১	১-৪-০	১-১-০

কিন্তু সুবোধ সেনের কোন যুক্তিই কমিটি গ্রাহ্য করল না। তারা ভোটের জোরে বেতন কাটা পাশ করিয়ে নিল।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এ আই টি ইউ সি কর্মীদের এই বেতন কাটার বিরুদ্ধে এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মাসের পর মাস প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এইচ এম এস এবং আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের কাছে আবেদন জানান হয় যে তারাও যেন মালিকদের পাঁচ টাকা মণ দরে চাল বিক্রী করাতে বাধ্য করতে যুক্ত আন্দোলনের অংশীদার হন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সালেও বহু বাগানেই এ আই টি ইউ সি-র ও এইচ এম এস-এর পরস্পর বিরোধী ইউনিয়ন ছিল।

১৯৫৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন ডুয়ার্সে এবং তরাই-এ ছিল পুরুষদের জন্য ১.৩৪ টাকা, এর মধ্যে ০.৭৫ ছিল মূল বেতন ০.৫৯ টাকা মহার্ঘভাতা। ১৯৫৩ সালের ১৫ই জুন সরকার মহার্ঘভাতা ০.০৭ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে করল ০.৬৬ টাকা, মূল বেতন একই থাকল। অর্থাৎ মোট বেতন হল ০.৭৫ + ০.৬৬ = ১.৪১ টাকা। এ সবই কিন্তু রেশনের চালের দাম ৫ টাকা মণ থেকে ১৫ টাকা করার পরে।

ঐ সময় অর্থাৎ '৫৩ সালে এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়নের দাবি ছিল মূল বেতন দৈনিক ০.৭৫ টাকার জায়গায় ২.০০ টাকা করতে হবে এবং চাল পূর্বের মূল্য পাঁচ টাকা মণ দরে সরবরাহ করতে হবে। আর এইচ এম এস-এর দাবি ছিল চালের দাম সাড়ে সতেরো টাকা রেখে মোট বেতন মাত্র আট আনা বাড়াতে হবে।

কাজেই দাবির ব্যাপারে বিরাট পার্থক্য এবং শ্রমিকদের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে এ আই টি ইউ সি-সঙ্গে অন্য দুই সংগঠনের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এটাই ছিল সেদিনকার এ আই টি ইউ সি-র নির্দেশ।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে এইচ এম এস এককভাবে জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানে তিন দিনের ধর্মঘটের ডাক দেয়। কিন্তু এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়ন এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে নি।

ধর্মঘটটি খুবই আংশিক হয়। ঐ সময় এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে এইচ এম এস-এর বিরোধ অত্যন্ত তীব্র ছিল। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, এইচ এম এস-এর ইউনিয়ন সংগঠিত হবার প্রথম থেকেই চা-মালিক সমিতিগুলির প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় সাহায্য পেয়ে আসছিল, কারণ এইচ এম এস ইউনিয়নের নেতারা সকলেই প্রথমদিকে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে কংগ্রেসের সভ্য ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বে গঠিত এবং পরিচালিত ইউনিয়নগুলো ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে ভারতে অবস্থিত দেশী-বিদেশী সমস্ত মালিকদেরই সক্রিয় সহায়তা এবং সাহায্য পেয়ে আসছিল। চা-বাগানেও মালিকরা কংগ্রেসী ইউনিয়নগুলিকে একইভাবে সাহায্য দিয়ে আসছিল। দেবেন সরকার ১৯৪৭ সালেও ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চা-মালিক সমিতির কাছে চা-বাগানগুলিতে ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য সাহায্য চেয়ে চিঠি দেন। এই চিঠি পেয়ে ভারতীয় চা-মালিক সমিতির ডুয়ার্স ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান তাদের '৪৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের সভায় এই আশা প্রকাশ করেন যে, ডুয়ার্স ব্রাঞ্চের লেবার অফিসার মিঃ জেনকিন্স যেন চেষ্টা করেন যাতে একজন পুরানো কংগ্রেস কর্মীকে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক যে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছেন সেটা যেন না হয়।

[সূত্র : ডি বি আই টি-এর নাগরাকাটা সাবডিস্ট্রিক্ট-এর ১৭-৯-৪৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যাবলী হইতে উদ্ধৃত।]

সাধারণভাবে এ আই টি ইউ সি সংগঠিত চা শ্রমিকরা আই এন টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-এর ইউনিয়নগুলিকে মালিকদের ইউনিয়ন বলেই মনে করত।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৮ সালে যখন কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়, তখন মালিকরা পুলিশ এবং কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়নের সহায়তায় বাগানে বাগানে এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়নের শ্রমিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। সেই সময় সমস্ত শ্রমিক নেতা হয় জেলে ছিলেন নয়ত আত্মগোপন করেছিলেন, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীরা প্রায় সবই তখন জেলে ছিলেন। বাগানে বাগানে এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্বের অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়নগুলি। চা-শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়ন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ইউনিয়ন থাকে আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে, অন্যটি এইচ এম এস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু এই দুটি ইউনিয়নেরই ভূমিকা এবং চরিত্র ছিল একই।

দার্জিলিং জেলায়ও গুর্খা লীগ পরিচালিত ইউনিয়নের ভূমিকা ডুয়ার্সের আই এন টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-এর ইউনিয়নগুলির মতই ছিল।

১১।৮।৪৭ তারিখে অনুষ্ঠিত দার্জিলিং প্লান্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের (ইণ্ডিয়ান টি প্লান্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং শাখা) এক সভায় গুর্খা লীগ এবং কংগ্রেসের সভ্যদের ইউনিয়ন গঠন করার ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। কংগ্রেসের পরিচিতি পত্র থাকলে বাগানের ভিতর তাদের সভা করবার অনুমতি দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব খুবই কম ছিল, গুর্খা লীগের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। গুর্খা লীগের জন্মকাল থেকেই এই সংগঠন দার্জিলিং-এর নেপালী ভাষাভাষী মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কিন্তু চা-বাগানে ইংরেজ মালিকদের অকুণ্ঠ সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়ে এরা শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলল।

শহরাঞ্চলের নেপালী মধ্যবিত্তের মধ্যে ইংরেজের প্ররোচনায় বাঙালী বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে উঠেছিল এবং '৪৭ সালে বাঙালী নেপালী দাঙ্গা লাগিয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় মনোভাবের ফলে এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ঐক্য রক্ষার চেষ্টার ফলে এই দাঙ্গা বেশীদূর পর্যন্ত এগোতে পারে নি।

কিন্তু এই গুর্খা লীগ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত চার বৎসরকাল প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার চালিয়ে এসেছে। বাগানে বাগানে এ আই টি ইউ সি নেতৃত্বের অনুপস্থিতির সুযোগে (কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী হবার পর) মালিকরা, পুলিশ এবং গুর্খা লীগের সহায়তায় এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়নগুলির শ্রমিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালায় এবং এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়ন ভাঙতে চেষ্টা করে।

১৯৫১ সালে হাইকোর্ট একটি রায়ে সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণাকে নাকচ করে দেয়। '৫১ সালের নির্বাচনেব পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং কর্মীরা জেল থেকে মুক্ত হন এবং আত্মগোপনকারীদের উপর থেকেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়। এ আই টি ইউ সি-র কর্মীবা জেল অথবা আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে ইউনিয়নগুলিকে পুনর্বার সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু করেন। ঐ '৫২-'৫৩ সালে যুদ্ধোত্তর-কালের অর্থনৈতিক মন্দার জের চলছিল, বিভিন্ন শিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থাতে এ আই টি ইউ সি-র সামনে প্রথম এবং প্রধান প্রশ্নটি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য কিভাবে গড়ে তোলা যায়। একদিকে আই এন টি ইউ সি-র ভূমিকা, তাদের প্রচণ্ড কমিউনিস্ট-বিরোধী, এ আই টি ইউ সি বিরোধী এবং ঐক্য-বিরোধী মনোভাব, আর অন্যদিকে ছাঁটাই, বেকারী এবং শ্রমিকশ্রেণীর উপর আক্রমণ। এই পটভূমিতেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টার

ইতিহাস ভারতের শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায় হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকবে। এই ঐক্যের জন্য সংগ্রাম ঐ সময়ে দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স-এর চা-বাগান অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করেছিল।

ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা

ছাঁটাই ও বেকারী ১৯৫২-৫৩ সালে কেবলমাত্র চা-শিল্পেই সীমিত ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে মহাযুদ্ধের পরে সরকারী হিসাব মতে ৫০ লক্ষ মানুষকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছিল, উপরন্তু ১০ লক্ষ সামরিক বাহিনীর লোকেরও চাকুরী যায়। ১৯৪৫-৫২ সাল এই সাত বছরে নতুন চাকুরীর ব্যবস্থা খুব সামান্যই হয়েছে, প্রায় হয় নি বললেই চলে।

বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়নের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এই চার মাসে ৩৮ লক্ষের ওপর কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিন সপ্তাহে আসাম ও পশ্চিম বাংলায় ৮০ হাজার মেহনতী মানুষ ছাঁটাই হয়ে যায়। সাপ্তাহিক **কাগজ** মতামতের ২০শে জানুয়ারী, ১৯৫৩ সালের সংখ্যায় সারা ভারতের ছাঁটাইয়ের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি নিচে দেওয়া হল :—

ছাঁটাই ও মন্দায় যারা ঐ সময়ে শিকার হয়েছিলেন :

১।	সারাভারতে তাঁতশিল্পে নিযুক্ত তন্তুবায়	—২৭ লক্ষ
২।	চিরাক্কলের কাটুনি শ্রমিক	—দেড় লক্ষ
৩।	ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের কয়ার মজদুর	—এক লক্ষ
৪।	আসাম বাংলা ত্রিপুরার চা-শ্রমিক	—এক লক্ষ
৫।	মাদ্রাজ খাদি উৎপাদনকারী তন্তুবায়	—এক লক্ষ

৬। পশ্চিমবাংলার চটকল শ্রমিক —ত্রিশ হাজার

৭। বিহারের ২০ হাজার লাক্ষা শ্রমিক ও

লাক্ষা কৃষক—৭ লক্ষ

৮। বিহারের অভ্র শ্রমিক—কয়েক হাজার

৯। পশ্চিমবঙ্গে হাওড়ার ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক —৫ হাজার

ঐ সংখ্যার 'মতামত' কাগজে আরো উল্লেখ রয়েছে "প্রতিদিনই শত শত মানুষকে ছাঁটাই আর বেকারীর যুপকাষ্ঠে বলি দেবার কাজ অব্যাহত গতিতে চলেছে। কিন্তু কত শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাইয়ের বলি হয়েছেন তার সঠিক হিসেব মালিক বা সরকারের দপ্তরে পাওয়া যায় না।"

শ্রমিকরা কিন্তু কোনো কলে-কারখানায় বা চা-বাগানে ছাঁটাই, বেতন হ্রাস প্রভৃতি বিনা প্রতিবাদে এবং বিনা সংগ্রামে মেনে নেন নি। বহু জাযগায শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে মালিকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগরের ডানবার কটন মিলে ১৯৫২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'বি' শিফ্ট বন্ধ করে দিয়ে ১১০০ শ্রমিককে ছাঁটাই-এর নোটিশ দেয়। এর প্রতিবাদে শুধুমাত্র বি-শিফটের শ্রমিকরাই নয়, এ-শিফটের শ্রমিকরাও বি-শিফটের শ্রমিকদের সাথে একত্রে কারখানায় অবস্থান ধর্মঘট আরম্ভ করে। পুলিশ এসে শ্রমিকদের হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ দলে দলে এইসব শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসার ফলে মালিক শেষপর্যন্ত সাময়িকভাবে এই নোটিশ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় এবং অবস্থান ধর্মঘটকালীন বেতনও দিতে স্বীকৃত হয়।

ঠিক একইভাবে কাদাপাড়ার ক্যালকাটা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর মালিকের ২৭৫ জন শ্রমিক ছাঁটাই করার ষড়যন্ত্র কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে বানচাল হয়ে যায়। এইভাবেই কারখানার পর কারখানায়, এলাকার পর

এলাকায়, শিল্পের পর শিল্পে শ্রমিকরা ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন।

এই প্রতিরোধ আন্দোলনের আরো কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওযা হল। কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫১ সালে কর্তৃপক্ষের ছাঁটাই ও অন্যান্য জুলুমের বিরুদ্ধে ছয় হাজার শ্রমিক এক সাহসী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশের হস্তক্ষেপ বা অন্য কিছুতেই শ্রমিকদের এই সংগ্রাম থেকে পিছু হটাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষই ৮ই জানুয়ারী, ছাঁটাই করা হবে না, কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না এবং লক-আউট প্রত্যাহার করা হবে—এই প্রতিশ্রুতি দেবার পর এই এলাকার চৌদ্দটি ইউনিয়নের আহ্বানে ওইদিন বিকালেই অনুষ্ঠিত এক শ্রমিক সভায় ৯ই জানুয়ারী সকাল থেকে সমস্ত শ্রমিক সংঘবদ্ধভাবে কাজে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৮ই জানুয়ারী হাওড়ায় অবস্থিত ফোর্ট উইলিযম জুটমিলের একজন শ্রমিককে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে স্পিনিং ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত শ্রমিক কারখানার ভিতর ছয় ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট করে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই শ্রমিকটির পুনর্বহালের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয।

১৭ই জানুয়ারী "কুলটি আযরণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস"-এ কর্তৃপক্ষ কারখানার দুটি বিভাগের চারশো শ্রমিককে ছাঁটাই করার চক্রান্ত করে। শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের এই ষড়যন্ত্র জানার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে "কাজ কম করার ধর্মঘট" (গো-শ্লো) শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে কারখানার ভিতর সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করা হয়, কিন্তু শ্রমিকরা তাদের আন্দোলনে অবিচল থাকেন।

পানিহাটি বাসন্তী কটন মিলে ছাঁটাই ও শ্রমিকদের উপর শাস্তির প্রতিবাদে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে

ওঠে। কয়েকজন শ্রমিকের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে কারখানার ম্যানেজার ও ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জকে ঘেরাও করে। শেষ পর্যন্ত ঐ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়।

এইভাবে কারখানায় কারখানায় একদিকে শ্রমিকদের প্রতিরোধ আন্দোলন চলতে থাকে, অন্যদিকে বি পি টি ইউ সি-র উদ্যোগে ২রা জানুয়ারী ১০৯টি ট্রেড-ইউনিয়ন, কৃষক সভা এবং অন্যান্য গণ-সংগঠনের তিনশো প্রতিনিধি এক সভায় মিলিত হয়ে ১৯৫৩ সালের ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যভিত্তিক ছাঁটাই ও বেকারী বিরোধী সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সভা থেকেই মৃণাল কান্তি বসুকে সভাপতি করে ৩০ জন সদস্য নিয়ে ২১-২২ তারিখের সম্মেলনকে সফল করার জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

রাজ্য সম্মেলনের পূর্বেই এলাকায় এলাকায় ট্রেড-ইউনিয়ন, ছাত্র যুব প্রভৃতি সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে এলাকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। বরানগরে ৮ই ফেব্রুয়ারী ছাঁটাই বিরোধী এই রকম একটি স্থানীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে চার হাজার নরনারীর সমাবেশ হয়। আই এন টি ইউ সি ও বি পি টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়ন ও বহু স্বতন্ত্র ইউনিয়ন এই সম্মেলনে যোগ দেয়। স্থানীয় আই এন টি ইউ সি-র নেতা অনিল বসু এবং বি পি টি ইউ সি-র কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী ও ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে মৃণাল কান্তি বসু সম্মেলনে বক্তৃতা দেন।

বহরমপুরের মণীন্দ্র মিল সুতাকলে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ সালে খাগড়া বয়েজ হাইস্কুল ও বহরমপুর ট্রেনিং একাডেমীর সমস্ত ছাত্র ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে। ছাত্র শ্রমিক ঐক্যের এটা একটা নিদর্শন ছিল।

ছাঁটাই ও বেকারী বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন

১৯৫২ সালের বেকারী এবং ছাঁটাই বিরোধী তীব্র আন্দোলনের শীর্ষে দাঁড়িয়ে ২১শে এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে প্রতিনিধি সম্মেলন এবং ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৩৭টি গণ-সংগঠনের ৭০৮ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ঐ ২৩৭টি গণ-সংগঠনের মধ্যে ১৯৬টি ছিল ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন এবং বাকী ৪১টি ছিল কৃষক, যুব, ছাত্র, শিক্ষক, মহিলা, বস্তীবাসীদের সংগঠন, উদ্বাস্তু সংগঠন প্রভৃতি। বি পি টি ইউ সি ও ইউ টি ইউ সি-র বাইরেও বিভিন্ন নির্দলীয় শ্রমিক সংগঠন এমন কি আই এন টি ইউ সি অন্তর্ভুক্ত দুটি সংগঠন তাদের নেতাদের বিরোধীতা অগ্রাহ্য করে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মৃণাল কান্তি বোস অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বি পি টি ইউ সি-র সভাপতি সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণাপত্র এবং পরবর্তী কার্যক্রমের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন বি পি টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রণেন সেন

সম্মেলনে নিম্নলিখিত দাবি সম্বলিত ঘোষণাপত্র উত্থাপন করা হয়:—

(১) কোন শিল্পে ছাঁটাই করা চলবে না। ছাঁটাই না করে শিল্প চালু রাখার জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি ত্রি-দলীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

(২) বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা এবং চা-বাগানগুলি সরকারকে অধিগ্রহণ করতে হবে এবং শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে উপযুক্ত ট্রাস্টী বোর্ডের মাধ্যমে সেগুলি পরিচালনা করতে হবে

(৩) র‍্যাশনালাইজেশন-এর নাম করে কোন শিল্প থেকে

ছাঁটাই করা চলবে না। কলে-কারখানায় উন্নত ও 'শ্রমলাঘবের' যন্ত্রপাতি বসানো যেতে পারে, কিন্তু তার শর্ত : (ক) মাথাপিছু কাজের চাপ বৃদ্ধি করা চলবে না, (খ) মজুরী কমানো চলবে না ; (গ) বর্তমান সুযোগ সুবিধা বজায় রেখে কাজের ঘণ্টা কমাতে হবে।

(৪) বেকারদের বাধ্যতামূলকভাবে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(৫) বেকার ভাতা দিতে হবে।

(৬) বেকার বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তন করতে হবে।

(৭) বিদেশী প্রতিষ্ঠান হতে পদস্থ ইঙ্গ-মার্কিন অফিসারদের অপসারণ করার জন্য আইন পাশ করতে হবে।

(৮) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের এক পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(৯) ভূমিহীন কৃষক ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সমস্ত পতিত জমি সরকারের দখলে আনতে হবে।

(১০) গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট তৈরী, খাল কাটা, বাঁধ বাধা, পুকুর কাটা প্রভৃতির এক সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) কুটির শিল্প স্থাপন ও উন্নত করার জন্য সরকারের সাহায্য ও টাকা দিতে হবে।

(১২) অন্যান্য বিদেশী প্রতিযোগিতা হতে দেশী শিল্পের যথা-বিহীত রক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৩) সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি সমেত সমস্ত দেশের সাথে সরকারকে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও বিস্তার করতে হবে।

(১৪) বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও চাষীর হাতে জমি অর্পণ করতে হবে।

দাবিগুলিকে সরকার কর্তৃক মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য কতকগুলি কার্যক্রম উত্থাপন করা হয় :

(১) দেশব্যাপী ছাঁটাই বিরোধী ও বেকারী-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান।

(২) উপরোক্ত দাবির ভিত্তিতে মহকুমা হাকিম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মালিক প্রভৃতিদের কাছে ভূখা-মিছিল নিয়ে যাওয়া।

(৩) দেশের সর্বত্র ছাঁটাই বিরোধী ও বেকারী-বিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠা।

(৪) ১০ই মার্চ ১৯৫৩ বিধান পরিষদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ঐ দিনে সর্বত্র ছাঁটাই বিরোধী দিবস পালন।

(৫) উপরোক্ত দাবিসমূহের ভিত্তিতে ব্যাপক সই সংগ্রহ আন্দোলন।

(৬) তিন মাসের মধ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গে এক পূর্ণাঙ্গ সম্মেলন করার আহ্বান জানান।

ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল ও ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিতে ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ইউনিয়নের স্বীকৃতি ১৯৪৯ সালে বিলাতি ট্রাম কোম্পানী প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৫২ সালে ট্রামের ৯ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ছিল ৮,৫০০-র উপর এবং প্রতি মাসে পাঁচ হাজারের বেশী শ্রমিক চাঁদা দিতেন। ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিতে ৮,৫৬৫ জন শ্রমিক গণ-দরখাস্তে সই দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ মালিক তাতেও ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব-মূলক চরিত্র স্বীকার করতে রাজি হয না।

এছাড়া ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে কোম্পানী ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীস্থানীয় দেড়শত শ্রমিককে ছাঁটাই করে দিয়েছিল। ট্রামের শ্রমিকরা এই দুটি দাবিতে, অর্থাৎ ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল এবং ট্রামওয়েজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিতে সমগ্র

১৯৫২ সালের বিভিন্ন সময়ে বড় বড় সভা, শোভাযাত্রা, গণ-দরখাস্ত প্রভৃতি মারফত কোম্পানী এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে ট্রামওয়েজ ওযার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল ট্রাম কোম্পানীর হেড অফিসে গিযে উপস্থিত হয়। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি মহম্মদ ইসমাইল, সহ-সভাপতি সোমনাথ লাহিড়ী, সাধারণ সম্পাদক ধীরেন মজুমদার, শ্রমিক নেতা নৌরতন সিং প্রমুখ। সমগ্র শোভাযাত্রাটি পুলিশ সামনে পিছনে প্রকৃতপক্ষে ঘেরাও করে রেখেছিল। প্রায তিন ঘণ্টা ধরে শ্রমিকরা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করলেও ইংরেজ ম্যানেজার শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ম্যানেজারকে বের করে নিযে যায়। শ্রমিকরা পরে ওখান থেকে কার্জন পার্কে গিযে জমায়েত হন এবং ছ'টার সময় চার হাজারের বেশী শ্রমিক শোভাযাত্রা করে বিধানসভা অভিমুখে রওনা হন। বিধানসভার পশ্চিম দিকের গেটের সামনে জমায়েত হয়ে শ্রমিকরা শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করার জন্য দাবি করতে থাকেন। এ সময় বি পি টি ইউ সি-র নেতা ডাঃ রনেন সেন, জ্যোতি বসু এবং বঙ্কিম মুখার্জী অ্যাসেম্ব্লী হাউস থেকে বেরিয়ে এসে শ্রমিকদের সামনে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। জ্যোতি বসু বলেন যে, শ্রমিকদের দাবির প্রতি কংগ্রেস সরকারের কোন সহানুভূতি নেই। শ্রমিকরা যখন বাইরে তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বিলাতি কোম্পানীর সঙ্গে নূতন চুক্তিপত্রে সই করতে ব্যস্ত। এই সমাবেশের সামনে মার্কসবাদী ফরোয়াড ব্লকের নেতা কমরেড অমর বসুও তাঁর বক্তব্য রাখেন। প্রথম অবস্থায় শ্রমমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত রাত প্রায় আটটার সময শ্রমিকদের একটি

ডেপুটেশনের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন। এই ডেপুটেশনে অবশ্য কোন ফল হয় না, শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের কোন আশ্বাসই দিতে পারেন নি। অবশ্য পরের সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একটি ডেপুটেশনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে রাজি হন। শ্রমিকরা ১লা মার্চ ১৯৫৩ রাজ্যব্যাপী ছাঁটাই ও বেকার-বিরোধী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ট্রাম শ্রমিকদের দাবিগুলির মীমাংসা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর লড়াই-এর প্রতিজ্ঞা নিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

বি. পি. টি. ইউ সি-র সম্মেলন

১৯৫৩ সালের ২১শে ও ২২শে মার্চ কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে বি পি টি ইউ সি-র শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ছয়টি বছর ছিল এক গুরুতর সংকটের যুগ।

শ্রমিক আন্দোলনের যে গৌরবময় অধ্যায় ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে রচিত হয়েছিল,—যার পরিণতি ছিল ২৯শে জুলাই-এর সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট, তা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিপতিদের চিন্তিত করে তুলেছিল। সেই সময় হতেই সাম্রাজ্যবাদ ও দেশের ধনিকশ্রেণী একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ও অন্যদিকে বিভেদনীতি ও সংগ্রামী শ্রমিকদের ওপর তীব্র দমননীতির সাহায্যে বাংলা তথা ভারতের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা চালাতে থাকে।

২৯শে জুলাইর-এর পরবর্তী যুগেই এ আই টি ইউ সি ভেঙ্গে আই এন টি ইউ সি এবং সোস্যালিস্ট পার্টি পরিচালিত হিন্দ মজদুর সভা গঠিত হয়। এই ভাঙ্গনের ফলে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে

ভারতের শ্রমিকদের একমাত্র সংগঠন এ আই টি ইউ সি দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর অর্থাৎ ভারত স্বাধীন ঘোষিত হবার পর শ্রমিকদের একটি বড় অংশের মধ্যে কংগ্রেস এবং নেহরু সরকারের প্রতি মোহ আর অন্যদিকে আই এন টি ইউ সি-র পতাকাতলে সমবেত হলে বিনা সংগ্রামেই দাবি আদায় এবং চাকুরীর নিরাপত্তা সম্ভব হবে—শ্রমিকদের মধ্যে এই বিভ্রান্তিই ছিল তখনকার দিনে আই এন টি ইউ সি-ব অন্যতম মূলধন। এছাড়া যুক্ত বাংলা পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ ভাগ হয়ে যাওযার ফলে অনেক-গুলি যুক্ত ইউনিয়ন ভেঙে যায়।

পূর্ববঙ্গে অবস্থিত ইউনিযনগুলি দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বি পি টি ইউ সি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয। এটা অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। বহু শক্তিশালী ট্রেড-ইউনিয়ন, বিশেষভাবে রেল শ্রমিকদের ইউনিযনে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশ ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবের অংশে। এইসব ইউনিযনগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এ আই টি ইউ সি আরো দুর্বল হযে পড়ে। এটা অবশ্য লক্ষণীয যে তদানীন্তন অবিভক্ত পাঞ্জাবে অধিকাংশ শিল্প কারখানা এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন ছিল পশ্চিমাংশে। সুতরাং দেশবিভাগের ফলে পূর্ব পাঞ্জাবে প্রায কোনও শিল্পই রইল না।

সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে বিভ্রান্তি আরো চরমে ওঠে ১৯৪৮-৪৯ সালে। একদিকে সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে আদর্শগত বিভ্রান্তি দেখা দেয। অন্যদিকে কংগ্রেস সরকারের দমননীতির ফলে শুধু পশ্চিম বাংলারই সহস্রাধিক ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা ও কর্মী হয কারারুদ্ধ ছিলেন নতুবা তাদের ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। কংগ্রেস সরকার শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রকৃতপক্ষে বি পি টি ইউ সি-র সঙ্গে

যুক্ত প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নকেই বে-আইনী করে রেখেছিল। ঠিক এই সময়েই বি পি টি ইউ সি-র ভিতর থেকে আর একটি অংশ বেরিয়ে গিয়ে ইউ টি ইউ সি গঠন করে। এইভাবে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের পরিবর্তে চারটি শ্রমিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়।

১৯৫২ সালের নির্বাচন-পরবর্তীযুগে সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলন আবার দানা বেঁধে উঠতে থাকে। কংগ্রেস সরকারের ছয় বছরের রাজত্বে শ্রমিকদের বহু পরিমাণে মোহমুক্তি ঘটতে থাকে এবং তাঁরা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন। এরই সঙ্গে ১৯৫২ সাল থেকে বি পি টি ইউ সি-র নিরন্তর ঐক্য প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিম বাংলার শ্রমিক আন্দোলন এই সংকট কিছুটা পরিমাণে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

এই সম্মেলনের পূর্বে গত ছয় মাসের মধ্যে শুধু পশ্চিম বাংলায়ই লক্ষাধিক শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি কলে-কারখানায়, বাগানে, খনিতে র‍্যাশনালাইজেশনের নামে কাজের চাপ বৃদ্ধি, প্রকৃত মজুরী হ্রাস, কারখানায় কারখানায় নিত্য নূতন জুলুম, ট্রেড-ইউনিয়নের মৌলিক অধিকার হরণ প্রভৃতি নানা আক্রমণে পশ্চিম বাংলার শ্রমিক ও কর্মচারীরা জর্জরিত ছিল। ঐ সময় কিভাবে ট্রেড-ইউনিয়ন আইন লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করার অধিকার পর্যন্ত হরণ করা হয়েছিল তার একটি উদাহরণ হল বেঙ্গল ইমিউনিটি ওষুধ কারখানায় ইউনিয়ন গড়ার প্রচেষ্টা। ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করার জন্য যে সাত জন শ্রমিক ফর্মে সই করেছিল তাদের প্রত্যেককে মালিক ছাঁটাই করে দিয়ে কারখানা থেকে বের করে দেয়। দুবার এই রকম চেষ্টা হয় এবং দুবারই সাতজন সাতজন করে যারা সই করে তারা ছাঁটাই হয়ে যায়। ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাতজন কর্মরত শ্রমিকের সই প্রয়োজন হয়। সুতরাং দু'বারই যে কর্মরত

শ্রমিকরা সই করেছিলেন তাদের ছাঁটাই করে দেবার ফলে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হয় নি।

এই পটভূমিতেই ১৯৫৩ সালের বি পি টি ইউ সি-র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে মালিকশ্রেণীর মুনাফা শিকার, ট্রেড-ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে ছিল ঐ সম্মেলন। ১৭৯০ জন প্রতিনিধি ও দর্শক যোগ দিয়েছিলেন, দেড়লক্ষ সংগ্রামী শ্রমিকের প্রতিষ্ঠান বি পি টি ইউ সি-র সম্মেলনে। সম্মেলনে আগত ৫১৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৮৬৫ জনই ছিলেন কোন না কোন শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি। প্রায় সাত হাজার মধ্যবিত্ত কর্মচারীর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোট ৩৮ জন। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং চা-বাগান থেকে শুরু করে কয়লাখনি ও জাহাজী শ্রমিকরা যারাই ১৯৫৩ সালের ১০ই মার্চের ছাঁটাই বিরোধী অ্যাসেমব্লী অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সকলের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। এছাড়াও ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ৮২ জন। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৪৮ সালের পর এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে যুক্ত বহু ইউনিয়নই হয় ভেঙ্গে যায় বা আই এন টি ইউ সি দখল করে নেয়। এই সব ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অনেকেই দর্শক হিসাবে এই সম্মেলনে যোগ দেন।

৯৫২ সাল থেকে জ্যোতি বসু বি পি টি ইউ সি-র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সম্মেলনে গৃহীত তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলেন, "কংগ্রেস সরকারের প্রতি মোহমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর নূতন জাগৃতি শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে সমাবেশ ও ধর্মঘটের সঙ্গে ব্যাপক ঐক্য প্রচেষ্টা। ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে বি পি টি ইউ সি অন্য ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন, ইউ টি ইউ সি-র সঙ্গে একত্রে আন্দোলন করছে। বি পি টি ইউ সি বিশ্বাস করে—সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে,

ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে উন্নততর জীবনের জন্য, শান্তি রক্ষার জন্য বৃহত্তর সংগ্রামের প্রয়োজনে, সারা দেশে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেইজন্য বি পি টি ইউ সি আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।"

ঐ সময়ে বি পি টি ইউ সি-র সভাপতি ছিলেন প্রয়াত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তার সভাপতির ভাষণে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, "আজ পাঁচ-ছয় বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই, ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে, কাজের চাপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, জীবন ধারণের মত মজুরীর জন্য, ট্রেড-ইউনিযন অধিকারেব জন্য এবং সর্বোপরি বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রামে প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য।"

ঐ সম্মেলনে ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-র সভাপতি মৃণালকান্তি বসু। তিনি বি পি টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-এর ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে বলেন, "শ্রমিকশ্রেণীর একতা আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, এটা অনস্বীকার্য। আমি এই সম্মেলনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি যে ট্রেড-ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য এ আই টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-এব ঐক্যের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা কবব। আমার চেষ্টা বিফল হলে আমি শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিদায় নেব—আমার এই বিদায় হবে আত্মহত্যার সামিল। তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে অবশ্যই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করব।"

ঐ সম্মেলনে মূল প্রস্তাব ছিল ট্রেড-ইউনিয়ন ঐক্য সম্পর্কে; তাছাড়া ছিল একটি দাবি সনদের উপর প্রস্তাব, সরকারী শ্রমনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার উপর শ্রমিকশ্রেণীকে বিপুল আন্দোলন পরিচালনা করার আহ্বান জানিযে প্রস্তাব। তাছাড়া সম্মেলনে বিভিন্ন শিল্পের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। রোজেনবার্গ দম্পতির উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা মকুব করার দাবি জানান হয়।

বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এ্যালেন লে লীপের মুক্তির দাবি, উত্তর প্রদেশের কৃষক নেতা রামমোহন সিং ও অপর আঠাশ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগীর মুক্তির দাবি করে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪৫ জন সদস্য নিয়ে সম্মেলন কার্যকরী কমিটি গঠন করে। সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। জ্যোতি বসু থাকেন সহ-সভাপতি হিসাবে। এই সম্মেলন থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ডাঃ রণেন সেন। অন্যান্য যারা সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন—সুধীর মুখোটি, অরবিন্দ ঘোষাল, ধীরেন মজুমদার ও বিনয় চ্যাটার্জি। সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন মনোরঞ্জন রায় (১৯৪৭ সালের পর পুনর্নির্বাচিত), শৈলেন পাল, অজিত বিশ্বাস, দিলীপ রায় চৌধুরী, কালিপদ দত্ত ও রবীন মুখার্জী। কোষাধ্যক্ষ—হৃষিকেশ ব্যানার্জী ; অন্যান্য সদস্যগণ—মহম্মদ ইলিয়াস, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, কমলজী, সাদ ইমালী বেগ, সত্যনারায়ণ মুখার্জী, ধীরেন পাইন, আদিনাথ ব্যানার্জী, নিত্যানন্দ চৌধুরী, মনীন্দ্র বসু, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, মহম্মদ জহীর, রামকৃষ্ণ মজুমদার, সরোজ ঘোষাল, আবদুল মালেক, সুধাময় দাশগুপ্ত, এস এ. ফারুকী, অচিন্ত বসু, মহম্মদ আকবর, বেচন লাল, মহম্মদ ইসমাইল, অনাদি দাস, ডাঃ সুশীল বসু, রবীন সেন ও জগৎ বসু।

(সাপ্তাহিক মতামত ১৯৫৩, ২৮শে মার্চের সংখ্যা হইতে গৃহীত)

১৯৫৩ সালের ১৩ই মার্চ বিশাল বেকারী ও ছাঁটাই বিরোধী সমাবেশ শোভাযাত্রার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে শ্রমিক আন্দোলনে এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সম্পর্কে "শ্রমিক আন্দোলনের সামনে সব থেকে বড় প্রশ্ন হল ঐক্য"—এই শিরোনামে ২০শে জুন, ১৯৫৩ সালের মতামতের সংখ্যায় মনোরঞ্জন রায় লিখিত একটি রচনা হতে উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এই রচনাটি থেকে বোঝা যাবে সেই সময়কার শ্রমিক আন্দোলনের

মেজাজ এবং মালিক শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা কি ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং এই ঐক্যের জন্য কি ভাবে তারা সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল তারই বিবরণ।

"গত ১৩ই মার্চের বেকারী ও ছাঁটাই বিরোধী শোভাযাত্রার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে মজুর আন্দোলনের মোড় ঘুরেছে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। এর কারণ, প্রথমতঃ আজকের মজুর শ্রেণীর তথা মেহনতী মানুষের সম্মুখে যে প্রধান সমস্যা ছাঁটাই ও বেকারী তার সমাধানে পথের নির্দেশ দিয়েছিল ১৩ই মার্চ। দ্বিতীয়তঃ ছাঁটাই ও বেকারী বিরোধী সম্মেলন ও শোভাযাত্রায় ঐক্যের আহ্বানই ছিল প্রধান এবং এগুলি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে অনেকাংশে সফল হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে সম্ভব হয়েছে মার্কেন্টাইল কর্মচারী ইউনিয়নের ফেডারেশন এবং এ্যাসোসিয়েশনের মিলিত কমিটি গঠন। এই আন্দোলনের ফলেই শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণভাবে আন্দোলন এবং ঐক্য সম্বন্ধে নূতন চেতনা এসেছে।

এবারকার ঐক্যবদ্ধ মে দিবস পালন এবং মে দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহের অন্যতম কারণ হল ছাঁটাই ও বেকারী বিরোধী আন্দোলন।

শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকমাস পূর্বেও সাধারণভাবে যে একটা থমথমে ভাব ছিল, মিলিত ছাঁটাই বেকারী বিরোধী আন্দোলন এবং ঐক্যবদ্ধ মে দিবস পালনের ভিতর দিয়ে তা কেটে গিয়ে আন্দোলনের এক নূতন জোয়ার এসেছে। কয়েক মাস পূর্বেও যেভাবে কারখানার পর কারখানায় ব্যাপক ছাঁটাই চলছিল তা আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। অন্ততঃ শ্রমিক সাধারণ আজ আর ছাঁটাইকে বিনা প্রতিরোধে মাথা পেতে নিতে রাজী হচ্ছে না।

গত দুই মাসে পশ্চিমবঙ্গে মজুর ও কর্মচারীদের ধর্মঘট ও ঘেরাও প্রভৃতির সংখ্যা দেখলেই তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

এপ্রিলে বার্নপুরের লোহা কারখানার ১৬০০০ শ্রমিকদের এক-

দিনের জন্য অত্যন্ত সংগঠিত প্রতীক ধর্মঘট প্রমাণ করে শ্রমিক-শ্রেণীর চেতনার স্তর ও সংগ্রামী মনোভাব কত দ্রুত এগিয়ে গেছে।

গত মে-জুন মাসের ভিতর শুধু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পেই ১২টি কারখানার প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই ও ট্রেড-ইউনিয়নের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং বোনাস প্রভৃতির দাবিতে ধর্মঘট করেছে। একথা সত্যি, পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শ্রমিকদের ফেডারেশন গঠিত হবার ফলে তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি বেড়ে গেছে এবং সে শক্তি তারা অনুভব করছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকরা আজ পশ্চিম বাংলার সমস্ত শ্রমিক-শ্রেণীর নেতা হিসাবে এগিয়ে আসছে। মাইনে বাড়াবার দাবিতে তারা লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। গত এক মাসে উল্লেখযোগ্য-ভাবে বিভিন্ন ছোট-বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা সক্ষম হয়েছে মালিকদের আক্রমণ রুখতে।

গত এক মাসের এই সব সংগ্রাম থেকে আমাদের অন্যতম শিক্ষনীয় বিষয় হল শ্রমিকদের মনোভাবের সঠিক পরিমাপ করা, সময়মত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আপোষ আলোচনার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

শুধু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পেই নয়। গত এক মাসের মধ্যে আমরা দেখি সুতাকল, চটকল, কেমিক্যাল কারখানা, ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কাঁচকল, মিউনিসিপ্যালিটি [কলিকাতা কর্পোরেশন] বিড়ি, চামড়া গুদাম, এমন কি লণ্ড্রী শ্রমিকদের ভিতরেও ধর্মঘটের জোয়ার এসেছে। এছাড়া চা-বাগানে, রেলের অফিসে ঘেরাও হচ্ছে কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক কর্মচারীদের দ্বারা। এমন কি, আপীল ট্রাইবুনালের কর্মচারীরা পর্যন্ত রেজিস্ট্রারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কলম ধর্মঘট করেছে। মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের ইউনিয়নের সম্পাদকের উপর সাসপেন্সনের আদেশের বিরুদ্ধে শুধু যে সেই ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই কলম ধর্মঘট করেছিল তাই নয়, অন্যান্য ব্যাঙ্কের

কর্মচারীরাও তাদের সক্রিয় সহানুভূতি জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিনিধি পাঠায়। সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ২১শে মে, যার ফলে ব্যাঙ্কের কর্তারা বাধ্য হলেন সেই দিনই আদেশ তুলে নিতে।

অন্যদিকে স্বয়ং সরকারের স্টেট বাসের শ্রমিকরা প্রস্তুত হচ্ছে প্রতীক ধর্মঘটের জন্য তাদেব যুগ্ম সম্পাদকের ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে। প্রস্তুত হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের ২৫০০০ দেশরক্ষা শিল্পের শ্রমিকরা। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে সিভিল সাপ্লাইয়ের ১৯ হাজার শ্রমিক তাদের ৭৫০ জন ভাইয়ের ছাঁটাইযের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। প্রতিটি শিল্পে, কারখানায় কারখানায় এসেছে আন্দোলনের জোয়ার।

কিন্তু আজও শ্রমিকশ্রেণীর সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—"ঐক্য নাই আমাদের ভেতর।"

এই প্রশ্নের জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী। এই প্রশ্ন আজ আই এন টি ইউ সি-র শ্রমিকদের সামনে, প্রশ্ন আজ হিন্দ মজদুর সভার শ্রমিকদের সামনে, আর ঠিক একই প্রশ্ন এ আই টি ইউ সি-র ও ইউ টি ইউ সি-র শ্রমিকদেরও।

আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তা নিয়ে শ্রমিকদের ভিতর মতবিরোধ নেই। রাস্তা তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয় যদি ঐক্যের অভাব তারা অনুভব না করে। শ্রমিকদের কাছে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব প্রতিটি টি ইউ কর্মীর।

এই প্রশ্নটি সমাধানের জন্য পুনা সহরে ২১শে মে থেকে ২৬শে মে পর্যন্ত সারা ভারতের কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা মিলিত হয়েছিলেন। এই সভা থেকে তারা ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দলমত এবং সংগঠন নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

স্টেটবাস শ্রমিকদের সংগ্রাম

২৩শে জুন, ১৯৫৩ সালে কলিকাতা স্টেটবাস শ্রমিক কর্মচারীরা (১) ইউনিয়নের বরখাস্ত যুগ্ম সম্পাদকদের পুনর্বহাল; (২) ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপের দরুন শাস্তিপ্রাপ্ত ইউনিয়নের সহ সম্পাদকদের পুনর্বহাল; (৩) সকল শ্রমিক কর্মচারীর জন্য ঢালাও হারে সাময়িক ভাবে ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধি; (৪) ইউনিয়ন স্বীকৃতি ইত্যাদির দাবিতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের নোটিশ দেন। এটাই ছিল, স্টেটবাস শ্রমিকদের প্রথম সংগঠিত ধর্মঘটের প্রচেষ্টা।

শ্রমিক কর্মচারীরা দীর্ঘদিন যাবৎ কর্তৃপক্ষের আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকার তো দূরের কথা, ট্রেড ইউনিযনে যোগদান যাতে না করে তার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদেব ভিতর নানাভাবে ত্রাস সৃষ্টি করছিল। ইউনিয়ন ভাঙ্গবার জন্য ইউনিয়নের সম্পাদকদ্বয়কে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। স্টেট ট্রান্সপোর্টের শ্রমিক সংখ্যা তখন ছিল আড়াই হাজার: ২১ তারিখের ধর্মঘট বানচাল করার জন্য কর্তৃপক্ষ নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিকরা এইসব প্ররোচনা এবং কর্তৃপক্ষের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে নিজেদের ঐক্য অটুট রাখে। ধর্মঘটের পূর্বেই স্টেটবাস ইউনিয়নের নেতাদের পুনর্বহালের দাবিতে বি পি টি ইউ সি-র সভাপতি প্রয়াত সত্যপ্রিয বন্দ্যোপাধ্যায়, এম পি বি পি টি ইউ সি-র সহসভাপতি জ্যোতি বসু এম, এল, এ এবং জ্যোতিষ জোয়ারদার এম, এল, এ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে সুবিবেচনার আশ্বাস দেন এবং নিজেই বিরোধের নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। এই জননেতাদের যুক্ত বিবৃতির ভিত্তিতে স্টেটবাস শ্রমিকরা তাদের ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করে নেন।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত

১৯৫৩ সালের ৩০শে জুন ও ১লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। এই দুই ঘটনায় ঐক্যবদ্ধ এবং উল্লেখযোগ্য আন্দোলনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

৩০শে জুন সারা ভারতের দুই লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার দেশরক্ষা শ্রমিক একদিনের সফল প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। ভারত সরকারের দেশরক্ষা শ্রমিক বিভাগের অন্তর্গত অর্ডিন্যাস ফ্যাক্টরী, অর্ডিন্যান্স ডিপো, মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস, ই, এস, ডি; ই এম ই; নৌ ও বিমান বহরের বিভিন্ন কম্যাণ্ড ও ওয়ার্কশপ প্রভৃতির শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ডাক ও তার শ্রমিকদের ধর্মঘটের পর ঐ সময়ের মধ্যে এত বড় সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘট আর হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গের কাশীপুর, ইছাপুর, পানাগড় প্রভৃতি স্থানে শ্রমিকরা দমননীতি এবং পুলিশের উস্কানি অগ্রাহ্য করে অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে ধর্মঘট চালিয়ে যান। কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক বাবুলাল সিং এবং শচীন্দ্রনাথ দে, রঞ্জিত কুমার গাঙ্গুলী এবং রতনচন্দ্র পালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কিরকি, ডেহুরোড ও পহেলগাঁও এর বিভিন্ন কেন্দ্রে তেত্রিশ হাজার শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। জব্বলপুরে তের হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করেন। কানপুরে আটাশ হাজার শ্রমিক এবং মধ্যপ্রদেশে চৌদ্দ হাজার শ্রমিক প্রতীক ধর্মঘটে যোগদান করেন। বৃহত্তর বোম্বাই-এর পাঁচ ছয় হাজারের বেশী এবং এলাহাবাদের প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে এক অপূর্ব ঐক্যবোধের পরিচয় দেন।

শ্রমিকদের মূল দাবী ছিল কাউকে ছাঁটাই করা চলবে না। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই পুনায় নয়শো ত্রিশ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছিল এবং অন্যান্য জায়গায়ও ছাঁটাই চলছিল। এছাড়া দেশরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মহাবীর ত্যাগী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছিলেন যে কমপক্ষে চার হাজার দেশরক্ষা শ্রমিককে ছাঁটাই করা হবে। শ্রমিকরা দাবি করেছিল ট্যাঙ্ক তৈরীর কারখানায় ট্র্যাক্টরও তৈরী করতে হবে। যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর যন্ত্র দিয়ে বেসামরিক প্রয়োজনের অন্যান্য মেশিন তৈরী করে শ্রমিকদের কাজে নিয়োজিত করে রাখতে হবে। এছাড়া, দেশরক্ষা শ্রমিকদের ব্যাপারে '৫০ সালে ভারত সরকার নিয়োজিত কল্যাণওয়ালা কমিশনের রায় সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে।

৩০শে জুনের দেশরক্ষা শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২৩শে ও ২৪শে মে কানপুরের ঐক্য সম্মেলনে। ১৯৪৭ সালে দেশরক্ষা শ্রমিকদের একটি সংগঠনই ছিল, কিন্তু '৪৮ সালে এই সম্মেলন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার সুযোগে সরকার শ্রমিকদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দেশরক্ষা শ্রমিকদের শিখিয়েছে, সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্য ছাড়া সরকারী শ্রমনীতির প্রতিরোধ অসম্ভব। তাই তাঁরা কানপুরের ঐক্য সম্মেলনে একই দাবির ভিত্তিতে তিনটি ইউনিয়নকে মিলিত করে সমস্ত দেশরক্ষা শ্রমিকদের একটি মাত্র সংগঠনে পরিণত করলেন।

দেশরক্ষা শ্রমিকদের এই ঐক্য প্রচেষ্টা সেদিন ভারতের অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদেরও এক সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছিল।

৫

এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্ন

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, ১৯৫৩ সালের ১লা জুলাই থেকে কলকাতা ও হাওড়ায় ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ। কংগ্রেস সরকার বিলাতি ট্রাম কোম্পানির ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস বাদে সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি মিলিতভাবে একটি সর্বদলীয় ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। তার সভাপতি ছিলেন প্রয়াত ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী। (স্মরণ রাখা দরকার যে স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রী হিসাবে এই ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জীই শ্রমিকদের উপর পুলিসী অত্যাচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ঠিক স্বাধীনতার পূর্বে এ আই টি ইউ সি ভেঙে আই এন টি ইউ সি গঠনের প্রস্তাবটি তিনিই উত্থাপন করেন।) এই কমিটি জনসাধারণকে বর্ধিত হারে ভাড়া দিতে অস্বীকার করার আহ্বান জানায়। ১লা জুলাই ভোর থেকেই বালিগঞ্জ, কালিঘাট, পার্কসার্কাস, কার্জনপার্ক, শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া, শিয়ালদহ, হাওড়ার সমস্ত ডিপো ও বিভিন্ন চৌমাথায় সারা দিন স্বেচ্ছাসেবকরা নিজ নিজ দলের ফেস্টুন ও ঝাণ্ডা নিয়ে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে বাড়তি ভাড়া না দেবার জন্য যাত্রীদের মধ্যে প্রচার চালান। বিভিন্ন দলের স্বেচ্ছাসেবকদের ঐ ঐক্যবদ্ধ প্রচারের ফলে যাত্রীরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বাড়তি ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। ট্রামের কণ্ডাক্টাররাও যাত্রীরা বাড়তি ভাড়া

দিতে অস্বীকার করলে চুপচাপ বসে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, জন-সাধারণের সঙ্গে বাড়তি ভাড়া না দেবার ব্যাপারে ট্রামের শ্রমিকরা পূর্ণ সহযোগীতা করেন। মালিক টিকিটের ভাড়া বাড়াবার ফলে একমাসের জন্য প্রায় সবাই মাসিক টিকিট নবীকরণ না করে জমা দেন। হাওড়ায় দৈনিক যেখানে বারো হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হতো সেখানে ১লা জুলাই কেবল একশো পঞ্চান্ন টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। এর ফলে বিলাতি ট্রাম কোম্পানী ১লা জুলাই কোন টিকিট বিক্রি না হবার অজুহাত দেখিয়ে এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর পরে ট্রাম শ্রমিকরা যে দুদিন ধর্মঘট পালন করেছিল তাতে ৮০ হাজার টাকা ট্রাম কোম্পানীর ক্ষতি হয়েছে এই কথা বলে, ১৯৫৩ সালে শ্রমিকদের কোন বোনাস দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করে। এটা স্বাভাবিকভাবেই ট্রাম শ্রমিক এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করাব অপচেষ্টা ছিল। কিন্তু ট্রাম শ্রমিকরা বিলাতি মালিকের ও রাজ্য সরকারের সমস্ত প্ররোচনা ও বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে জন-সাধারণের সঙ্গে ঐক্য অটুট রাখেন।

একদিকে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনসাধারণের এই সকল প্রতিরোধকে অভিনন্দন জানিয়ে ট্রাম শ্রমিকদের প্রতি নির্দ্দেশ দেন যাতে শ্রমিকরা জনসাধারণের এই প্রতিরোধ আন্দোলনে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করার প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম শ্রমিকদের প্রতি বিলাতি ট্রাম কোম্পানীর এই হুমকির নিন্দা করে সর্বদলীয় প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ট্রাম শ্রমিকদের সংগ্রামে জনসাধারণের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই সর্বদলীয় ঐক্য, শ্রমিক আর জনসাধারণের সচেতন মৈত্রীই ছিল ঐ আন্দোলনের মূল শক্তি। কোম্পানীর বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার ফলে সরকার জনসাধারণের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। শত শত যাত্রীকে

বাড়তি ভাড়া দিতে অস্বীকার করার জন্য গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবকদের উপর পুলিস বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে গ্রেপ্তার করতে থাকে। জ্যোতি বসু, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, গণেশ ঘোষ, সুবোধ ব্যানার্জী প্রমুখ প্রতিরোধ কমিটির নেতাদের নিয়ে একদিনেই আটশোর বেশি স্বেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেটা হয় ৩রা জুলাই। সেদিনই বিকালে ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে এক সমাবেশ থেকে প্রতিরোধ কমিটি ঘোষণা করে ৪ঠা জুলাই কলকাতা এবং হাওড়ায় হরতাল হবে। পুলিসী দমননীতির বিরুদ্ধে এই হরতালের আহ্বানে শুধু কলকাতা ও হাওড়ায়ই নয়, চব্বিশ পরগণা, হুগলী ও অন্যান্য জায়গায় এই হরতাল ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাম ইউনিয়নের আহ্বানে ট্রাম শ্রমিকরাও এই হরতালে যোগদান করে। স্কুল কলেজের ছাত্ররাও ধর্মঘটে যোগ দেয়, দোকানপাট বাজারহাট সবই সেদিন বন্ধ ছিল। কলকাতা ও তার আশেপাশে বাস অথবা ট্রেন কোনটাই সেদিন চলেনি। কলকাতা এবং শহরতলীর কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। হাজার হাজার মানুষ পুলিসী দমননীতি ও ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। পুলিস শুধু গ্রেপ্তার লাঠিচার্জ ও টিযার গ্যাস চালিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। দমদমে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর পুলিস এগারো রাউণ্ড গুলি চালায়। একটি কিশোর গুলিতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। টিয়ার গ্যাসের দৌরাত্ম্যে একজন বৃদ্ধা মারা যায়।

পরদিনই ৫ই জুলাই থেকে প্রতিরোধ কমিটি "ট্রাম বয়কটের" সিদ্ধান্ত নেন। পরদিন থেকেই সমস্ত কলকাতা হাওড়ায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। হাজার হাজার অফিস আদালতের যাত্রী পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান তুলছেন "বাসে যাব, হেঁটে যাব, তবুও ট্রামে চড়বো না।" এই শ্লোগান মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কলকাতা ও হাওড়ায়। রাস্তা দিয়ে খালি ট্রাম চলে যায় তার পাশেপাশেই হাজার হাজার মানুষ

পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ ট্রামে উঠছে না—সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সাধারণ মানুষের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক ঐক্যের এক অপূর্ব নিদর্শন রেখে গিয়েছিল ট্রামের শ্রমিকরা ও কলকাতা হাওড়ার সাধারণ মানুষ।

যাহোক ট্রামভাড়া প্রতিরোধ আন্দোলন চলতে থাকে। ৯ই জুলাই ছাত্রদের এক সমাবেশ ও মিছিলের উপর নৃশংসভাবে লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চালানোর ফলে ত্রিশজনেরও বেশী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল। এই সময়ের মধ্যে ১৫০০ জনেরও বেশী সাধারণ মানুষ, ছাত্র, যুব, শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়। এছাড়া নিবর্তনমূলক আইনে যে নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু, অমর বসু, গণেশ ঘোষ, সুবোধ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ ঘোষাল, মোহিত মিত্র, শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখার্জী, বিশ্বনাথ দুবে, অম্বিকা চক্রবর্তী, জলি কল, সোমনাথ লাহিড়ী, নিখিল দাস, শিবনাথ ব্যানার্জী, সুধীর মুখার্জী প্রমুখ। কিন্তু এর ফলে প্রতিরোধ আন্দোলন দমে যাওয়া তো দূরের কথা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ৯ই জুলাই ছাত্রদের উপর বর্বর লাঠি চালনার প্রতিবাদে ১০ই জুলাই সারা কলকাতা শহরতলী এবং হাওড়ায় ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। ১১ই জুলাই প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিরোধ দিবস পালন করার আহ্বান জানানো হয় এবং ১৫ই জুলাই সারা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করার আহ্বান জানানো হয়।

১২ই জুলাই চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড-ইউনিয়ন—বি পি টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি, হিন্দ মজদুর সভা এবং আই এন টি ইউ সি যুক্তভাবে ১৫ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান। ডালহৌসী স্কোয়ারে শতাধিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি সভায় ১৫ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আবেদন জানান

হয়। এর ফলে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

এর মধ্যে ১৪ই জুলাই এক মজার ঘটনা ঘটে। তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক বিবৃতি দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনকে নিন্দা করে ১৪ই জুলাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সমাবেশে জনসাধারণকে উপস্থিত হতে এবং ১৫ই জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ করতে আহ্বান জানান। ১৪ই জুলাই বিকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দুই শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে শতাধিক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ১৫ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ করার ধ্বনি দিতে দিতে এক শোভাযাত্রা বের হয়। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ অতুল্য ঘোষের মিছিলের পেছনে পেছনে গিয়ে হরতাল সফল করার ধ্বনি দিতে থাকে। চৌরঙ্গীর মোড়ে পৌঁছবার পূর্বেই পেছনের শোভাযাত্রীদের সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হয়ে যায়। অতুল্য ঘোষের শোভাযাত্রাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় বিরাট পুলিশ বাহিনী। পিছনের জনগণ অবশ্য সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অতুল্য ঘোষ তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুতগতিতে চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে ঢুকে পড়েন।

১৫ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক গণজাগৃতি পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দশ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে সামিল হন, লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘটে যোগ দেয়। এছাড়া দিনমজুর, বিড়িশ্রমিক, কর্পোরেশন শ্রমিক, রিক্সা-ঠেলা-গরুর গাড়ী চালক প্রভৃতি সবাই এই ধর্মঘটে যোগদান করে। শহরের মানুষের সঙ্গে গ্রামের মানুষও, এমন কি গ্রামের কৃষক ও ক্ষেত-মজুররাও কাজ বন্ধ করে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে এক হয়ে এই ধর্মঘটে যোগদান করে। ১৫ই জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘট এক

গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়, এটা ১৯৪৫ সালের ২৯শে জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সরকারও চুপ করে বসে থাকেনি। ১৫ই জুলাই সকাল নয়টার সময় যাদবপুরে পুলিশ গুলি চালিয়ে সন্ন্যাসী সর্দার নামে একজন শ্রমিক ও আরেকজন কিশোরকে হত্যা করে। ১৫ই জুলাই দমদম বিমানঘাঁটি থেকে একটি বিমানও আকাশে উড়তে পারেনি বা মাটিতে নামতে পারে নি। কলকাতার বড়বাজার, রাজাকাটরা, পোস্তার সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বিশেষ করে বর্ধমানের শ্রমিক অঞ্চলে রাণীগঞ্জ, আসানসোলের কয়লাখনি ও ইস্পাত শ্রমিকসহ প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেন।

ঐদিন বিকেলে মনুমেণ্ট ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশ হয়। পুলিশ এই সমাবেশে মাইক ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষাধিক মানুষ এই সমাবেশে উপস্থিত থেকে সরকারকে ধিক্কার জানায়, সমাবেশ থেকে দুটি শোভাযাত্রা একটি দক্ষিণে এবং একটি উত্তরে রওনা হয়। পথে উত্তর কলকাতামুখী শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশ লাঠি, টিয়ার গ্যাস নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। জনতা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে পুলিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ১৬ই জুলাই জনতার প্রতিরোধ দক্ষিণ-কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। পুলিসকে সাহায্য করার জন্য সরকার সামরিক বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়। পুলিশ লাঠি মেরে পঞ্চান্ন বছরের এক শিক্ষককে হত্যা করে। ঐদিনই একজন পুলিশ সার্জেণ্ট নেবুতলা এলাকায় গুলি চালিয়ে বাইশ বছরের যুবক ভবানী প্রসাদকে হত্যা করে। সরকার ১৬ই এবং ১৭ই জুলাই রাস্তায় কোন ট্রাম বা বাস বের করতে সাহস পায় না। ট্রাম শ্রমিকরা ১৭ তারিখেই ঘোষণা করেন যে তাঁরা ১৮ তারিখ থেকে ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থনে অনির্দিষ্টকালের

জন্য ধর্মঘট শুরু করবেন। ১৭ই জুলাই হাওড়া টাউন হলে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং ট্রাম মজদুর পঞ্চায়েত এক যুক্ত সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়—যতদিন পর্যন্ত ট্রাম কোম্পানী ও সরকার প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত না হচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত ট্রাম শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। এখানে উল্লেখ্য যে ১৫ই জুলাই ট্রাম মালিক ও সরকার একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে কিছু ট্রাম বের করতে সমর্থ হয় এবং ট্রাম শ্রমিক ও সংগ্রামী জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করাব চেষ্টা করে। ট্রাম শ্রমিকদের যুক্ত কমিটির অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের আহ্বান ঐ ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত জবাব ছিল। ১৫ তারিখ গভীর রাতেই সরকার সমগ্র কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু জনতা প্রতিদিনই ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা করা অব্যাহত রাখে। ১৭ই জুলাই ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে যাদবপুরে বিজয়গড় কলেজ প্রাঙ্গনে প্রায় সহস্রাধিক মানুষের সভা থেকে শহীদ সন্ন্যাসী সর্দারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবার শপথ নেওয়া হয়। ১৭ই জুলাই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে সভা শোকযাত্রা করে কিছু মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করেন। হাজরা পার্কের সমাবেশ ভেঙ্গে দেবার জন্য পুলিশ দুবার গুলি চালায়! ২০শে জুলাই কালীঘাট পার্কে এক সমাবেশের উপর, শান্তিপূর্ণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের উপর, এমনকি সত্যাগ্রহী হিসেবে যাঁরা গ্রেপ্তারবরণ করেছিল তাদেরও প্রচণ্ড মারধর করে আহত অবস্থায় পুলিশের কয়েদী গাড়ীতে ঢুকিয়ে দেয়। পার্কে ক্রীড়ারত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পুলিশের এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। দুইজন মহিলাসহ এই পার্ক থেকে পুলিশ আরো ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে।

এই সভায় একজন প্রেস রিপোর্টারকে ধরে পুলিশ প্রচণ্ড প্রহার করে। তিনি প্রেসকার্ড দেখিয়েও নিস্তার পান নি।

তার চশমা ভেঙ্গে যায়। এই আন্দোলন চলাকালীন এর কয়দিন পূর্বে পুলিস স্বাধীনতার প্রেস রিপোর্টার তৃপ্তি গুহ এবং ফটোগ্রাফার শম্ভু ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করে জেলে রেখে দেয়। এমনকি বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে পুলিশ জানলা দিয়ে গুলি করার হুমকী দেখায়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ২২শে জুলাই ময়দানে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশের বহু পূর্ব থেকেই সাদা পোষাকে পুলিশ উপস্থিত থাকে। সভা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বি পি টি ইউ সি-র সভাপতি এবং প্রবীন জননেতা সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এম. পি কে নির্দয়ভাবে চুলের মুটি ধরে তুলে পুলিসের গাড়িতে নিয়ে তোলে। অনুরূপভাবে, হিন্দ্ মজদুর সভার সভাপতি এবং প্রবীন শ্রমিকনেতা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাটা মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি সুধীর মুখোটিকে প্রচণ্ড প্রহার করে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ সভা থেকে পুলিশ ২৪১ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রত্যেককেই প্রহারের সম্মুখীন হতে হয়।

সভার কিছু দূরে সাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ পুলিশ বাহিনী তাদের উপর কিল্ চড়্ লাঠি ও বুটের লাথি মারতে শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে এত তীব্র হয় যে সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ২৩ তারিখেই ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে এবং ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী ও অম্বিকা চক্রবর্তী সহ পাঁচজন নেতাকে মুক্তি দেয়। সাংবাদিকদের ওপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ ২৩ তারিখে এক সভায় মিলিত হয়ে সাংবাদিকদের উপর এই অত্যাচার এবং তাদের বৈধ কাজে বাধা সৃষ্টি করার ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে, এবং তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ কমিশনার ও হেড কোয়ার্টারের ডেপুটি কমিশনারকে বরখাস্ত করার দাবি করা হয়। সংবাদপত্র সেবী সংঘ আরো সিদ্ধান্ত নেয়—এক সপ্তাহ সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠান

বর্জন করা হবে; মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা সরকার কর্তৃক প্রচারিত কোন খবর বা বিবৃতি ছাপা হবে না; কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকের বিবৃতি ইত্যাদি বয়কট করা হবে। এছাড়াও সংবাদপত্র মালিকদের অনুরোধ করা হয় সাংবাদিকদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে একদিন সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ রাখার। এখানে উল্লেখ্য যে ঐদিন টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়ার ফটোগ্রাফার শ্যামাদাস বসু ও গনেশ সিংহ, অমৃতবাজার পত্রিকার তারক দাস ও পান্না সেন, বিশ্বামিত্রের বিভাস সোম, যুগান্তরের অমিয় তরফদার প্রমুখ ছয়জন ফটো-গ্রাফারের ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়। সাংবাদিকদের উপর এই অত্যাচার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও দেখা যায় নি। স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক গণতান্ত্রিক মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। দেশের সর্বত্র এই সীমাহীন বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ প্রেস অ্যাডভাইসরী কমিটি, প্রেস ক্লাব ও প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন একবাক্যে পূর্বে উল্লেখিত ছয়দফা দাবি ও প্রস্তাব গ্রহণ করে।

কলকাতার সংবাদসেবী প্রতিষ্ঠান সমুহের এই বীরত্বপূর্ণ প্রতি-রোধকে বিহার, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, বরোদা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক সংঘ ও জনসাধারণও সমর্থন ও সহানুভূতি জানায়। কলকাতার সংবাদপত্র সমূহের পরিচালক, সম্পাদক ও বিভিন্ন সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংবাদিকদের উপর পুলিশের এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে ২৮শে জুলাই একদিন সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়। ঐদিনই প্রতিরোধ কমিটিও সারা পশ্চিম বাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করার নির্দেশ দেয়।

পুলিশি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার ঐক্যবদ্ধ ঐতিহাসিক সংগ্রাম সমস্ত দেশে সপ্রশংস সমর্থন লাভ করে।

এই অবস্থায় কংগ্রেস সরকার ২৪শে জুলাই সাংবাদিকদের উপর নির্যাতনের ঘটনাটি একজন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১লা আগস্ট গেজেটে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার শরৎ কুমার ঘোষের পরিচালনায় ঐ নির্যাতনের বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বিদেশ থেকে ফিরে এসে ৩১শে জুলাই এক বিবৃতি মারফত জানান যে হাইকোর্টের বিচারপতি পি. বি. মুখার্জী কর্তৃক ট্রামে ভাড়ার হার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সম্পর্কে তদন্ত করবেন এই বিবৃতি প্রকৃতপক্ষে পাঁচদিন পূর্বেই দেওয়া যেত কিন্তু বন্দিমুক্তি ইত্যাদি ছাড়াও ধর্মঘট-কালীন বেতন, বোনাস এবং ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য কারো উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট তুলে নেবার অন্যতম শর্ত। কিন্তু ট্রাম কোম্পানী ধর্মঘটের জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না এই প্রতিশ্রুতি ছাড়া অন্য দুটি শর্ত সম্পর্কে কিছু বলতে রাজী না হওয়ায়, শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ৩০শে জুলাই সকালবেলা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রতিরোধ কমিটি এবং ট্রাম-শ্রমিকদের যুক্ত ধর্মঘট কমিটি ট্রাম-শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সুপারিশ করে। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে কিছু প্ররোচক শ্রেণীর লোক মজুরদের বোনাস এবং ধর্মঘট-কালীন বেতনের প্রতিশ্রুতি না পেলে ধর্মঘট না তোলার জন্য শ্রমিকদের উত্তেজিত করতে থাকে। ফলে সেদিনের সভায় ট্রাম-শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নি। সেইদিনই রাত্রে ট্রামের ডিপোতে ডিপোতে ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও ট্রামওয়ে মজদুর

পঞ্চায়েতের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের মধ্যে অসংখ্য ছোট বড় সভা করে বলেন ট্রামের শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছে সেই ঐক্যের শক্তির অপরাজেয় ঐক্যই ট্রামের শ্রমিকদের দাবি আদায় করার গ্যারান্টি। ট্রাম কোম্পানী এবং প্ররোচকেরা এই ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়। ট্রাম প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে মালিক কোম্পানীর ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত দায় শ্রমিকদের বেতন না দিয়ে কিছু পরিমাণে পূরণ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ট্রাম-শ্রমিকদের শুভবুদ্ধি, তাদের শ্রেণী চেতনা শেষ পর্যন্ত সরকার এবং মালিকের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিয়ে ৩১শে জুলাই সকালবেলা আবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয় যে সেদিন থেকেই ট্রাম চালানো হবে।

১৬ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের ফলে ট্রাম শ্রমিকদের মাথাপিছু ৫০-৫৫ টাকা ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার সমস্ত নরনারী, সংবাদপত্র ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির সমর্থন এবং বিলাতি ট্রাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য, মজুরদের বোনাস ও বেতনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত করবে—এটাই ছিল শ্রমিকদের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই বৎসরই পূজার পূর্বে ট্রাম-কোম্পানী শ্রমিকদের বোনাস দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু ধর্মঘট চলাকালীন বেতন পাওয়া যায় নি।

বন্দী মুক্তির ব্যাপারেও শেষ পর্যন্ত অনেক টানা-হেঁচড়ার পর সমস্ত বন্দীদেরই বিনা সর্তে মুক্তি দেয়। কেবল মাত্র ১১ জন, যাদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছিল, তাদের জামিন দেওয়া হয়।

ঐক্যই ছিল জয়ের মূল শক্তি

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল, স্বাধীনোত্তরকালে তার কোনো নজীর নেই। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল শ্রমিকদের

সমর্থন নিয়ে সেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকা নিয়ে। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ছিল ঠিকই, কিন্তু আন্দোলন নির্ভরশীল ছিল জনসাধারণের ট্রাম বয়কট ও প্রতিরোধের উপর। শেষরক্ষা করে ট্রাম-শ্রমিকরা নিজেরা এগিয়ে এসে। যখন তাঁরা ঘোষণা করেন যে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ না করা অবধি তাঁরা ট্রাম চালানো বন্ধ রেখে ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন, তখনই এই আন্দোলনের একটি গুণগত পরিবর্তিত অধ্যায় শুরু হয়। সর্বোপরি সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক উচ্চতর পর্যায়ে তুলে ধরে। আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কথা ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ঐক্য, আর তারই সঙ্গে শহীদদের আত্মবলিদান শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সরকারকে বাধ্য করে জনতার কাছে সম্পূর্ণভাবে নতি স্বীকার করতে। জনসাধারণের অসন্তোষ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারী, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, রেশনে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি, শাসন পরিচালনায় দুর্নীতি এবং দেশের লোকের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কষ্টই ছিল ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের পটভূমি।

কিন্তু প্রশ্ন ছিল দুঃখকষ্ট অনেকদিন যাবৎ দেশের মানুষ ভোগ করছিলেন কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে এতদিন আন্দোলন সেভাবে গড়ে উঠেনি কেন? তার মূল কারণ ছিল কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব। যেদিন এই ঐক্য গড়ে উঠল সেদিন থেকেই এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাজেই বামপন্থী দলগুলি তথা গণতান্ত্রিক ঐক্যই ছিল আন্দোলনের সফলতার মূল শক্তি। এই ট্রামভাড়া আন্দোলন থেকে আরেকটি যে শিক্ষা আমরা পাই তা হোল বর্তমানে আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করলেও নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করতে পারেনি।[৩]

ইস্পাত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

১৯৫৩ সালের ৫ই জুলাই আসানসোলে বার্নপুর ইস্পাত কারখানার নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়ে এবং বেয়নেট বিদ্ধ করে সাতজন শ্রমিককে হত্যা করে এবং বহু শ্রমিককে আহত করে। আহতদের মধ্যে ছিলেন বার্নপুরের শ্রমিক নেতা বামাপদ মুখার্জী ও উমাপদ মুখার্জী; এদের অবস্থা খুবই গুরুতর হয়েছিল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী এম. এল. এ., সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম. পি., বি পি টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক রণেন সেন এম. এল. এ. প্রমুখ আসানসোলে চলে যান। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পুলিশ আহতদের দেখা করতেও দেয় না।

৫ই জুলাই বার্নপুর ইস্পাত কারখানার চৌদ্দ হাজার শ্রমিকের সংগ্রাম কমিটির শতাধিক সদস্যকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শ্রমিকদের এক মিছিল এস. ডি. ও-র কাছে এক ডেপুটেশনে যায় এবং নেতাদের মুক্তি দাবি করে। পুলিশ শ্রমিকদের প্রকৃতপক্ষে চলে যাবার কোন সময় না দিয়েই নির্বিচারে গুলি, লাঠি, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে ঐ নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করে। এই গুলি চালনার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র কুলটি ও হীরাপুর থানাসহ সমগ্র আসানসোল এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

পরদিন ৬ই জুলাই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমগ্র আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে সাধারণ ধর্মঘট হয়। হাজার হাজার শ্রমিক ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে সভা ও মিছিল করে। উল্লেখযোগ্য যে এই নিহতদের মধ্যে একজন ছিল এগার বছরের বালক এবং দুজনকে হত্যা করা হয় বেয়নেট বিদ্ধ করে।

সপ্তাহে পুরো কাজ, বোনাস বৃদ্ধি, হট বোনাস, ছাঁটাই

শ্রমিকদের পুনর্বহাল প্রভৃতি দাবি নিয়ে জানুয়ারী মাস থেকেই শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ইউনিয়নটি ছিল আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে যুক্ত। আই এন টি ইউ সি নেতারা শ্রমিকদের এই দাবি ও আন্দোলন সমর্থন করতে অস্বীকার করে। ফলে শীট মিলের হট মিল সেকশনে শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে থেকে পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত করে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বার্নপুর ইস্পাত কারখানার মালিক স্যার বীরেন মুখার্জী ঐ পাঁচজন শ্রমিককে ছাঁটাই করে। ১৯৫৩ সালের ৯ই মার্চ কোম্পানী হট মিলের ৫০০ জন শ্রমিককে অস্থায়ীভাবে ছাঁটাই করে। ১০ই এপ্রিল আরো ৫০০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেয়। এর প্রতিবাদে হট মিলের ১১০০ শ্রমিক, মিলের ভিতর অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। ১৪ই এপ্রিল কারখানার প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রতিনিধি গিয়ে আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের নেতা মাইকেল জন ও বর্মার নিকট হস্তক্ষেপের আবেদন জানালে তারা শ্রমিকদের কোনও সাহায্য করতে শুধু অস্বীকার করে তাই নয়, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কাগজেও বিবৃতি দেয়। ঐ দিনই শ্রমিকরা প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে মোট ২০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে। এই সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ২৭শে এপ্রিল কারখানায় ১৪০০০ শ্রমিক একদিনের জন্য সফল ধর্মঘট পালন করেন। এদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বার্নপুরের জনসাধারণও হরতাল পালন করেন; স্কুল-কলেজ, বাজার-হাট প্রভৃতি বন্ধ থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ১৪০০০ শ্রমিকের প্রায় সবাই গণস্বাক্ষর দিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রায় ছয় মাস শ্রমিকদের এই সংগ্রাম চলতে থাকে। সংগ্রাম কমিটি ও শ্রমিকরা ইউনিয়ন অফিস দখল নিতে গেলে পুলিশ লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের সাহায্যে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং অফিস ঘরের সামনে

পুলিশের পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়। ঐ সংগ্রাম কমিটির একশো জন নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেই শ্রমিকরা আসানসোলের এস. ডি. ও অফিসে গণ ডেপুটেশনে গেলে উপরোক্ত হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গর্জে ওঠে। বার্নপুরের শ্রমিকদের নিচের তলা থেকে ঐক্য গড়ে তুলে সংগ্রাম পরিচালনার এটি ছিল একটি অপূর্ব নিদর্শন।

শ্রমিকরা দাবি আদায়ের জন্য "ধীরে কাজ" [গো স্লো] আন্দোলন চালিয়ে যায়।

এদিকে আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের অন্যতম নেতা বার্নপুরের ছোটেলাল ব্যাস, আই এন টি ইউ সি-র তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক কালী মুখার্জী ও সভানেত্রী ডঃ মৈত্রেয়ী বসু বার্নপুরের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে এবং শ্রমিকদের দাবি মেনে নেবার দাবি জানিয়ে বিবৃতি দেয়।

১৪ই আগষ্ট বার্নপুরের বারী ময়দানে অ্যাকশন কমিটির সভাপতি ছোটে লাল ব্যাসের সভাপতিত্বে ১৮,০০০ শ্রমিকের এক সভাথেকে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, আই এন টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় কমিটি ছোটেলাল ব্যাসের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার "অপরাধে" আই এন টি ইউ সি-র জেনারেল কাউন্সিল থেকে তার সভ্যপদ খারিজ করে দেয়। কালী মুখার্জীকে বার্নপুরের আন্দোলনে কোনরকম সমর্থন ও সাহায্য করা অথবা সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৫৩ সালের ২২শে আগস্ট, বার্নপুর কারখানা এলাকাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে। ২৪শে আগস্ট ভোর থেকেই সমস্ত এলাকাতেই রাজপুত সৈন্য এবং ব্যারাকপুর ও কলকাতা থেকে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এসে মোতায়েন করা হয়। ঐ দিনই গভীর রাত্রে কারখানার শেষ শিফটের কাজ

শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানাটি সশস্ত্র ফৌজের হাতে তুলে দিয়ে কারখানার গেটে এক নোটিশ টাঙিয়ে বলা হয় সমস্ত শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে এর পরদিনই অর্থাৎ ২৫ তারিখ শ্রমিকদের বেতনের দিন ছিল।

শ্রমিকদের দাবি ছিল সমস্ত ছাঁটাই শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে, ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার ও ইউনিয়নের কর্মকর্তা নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার শ্রমিকদের দিতে হবে—ঐ শর্তেই আলাপ আলোচনা মারফত বিরোধের মীমাংসা হতে পারে বলে অ্যাকশন কমিটি অভিমত প্রকাশ করে।

বার্নপুরের শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রশ্নটি পার্লামেন্টে তোলা হলে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু জবাব দেন "পরিণতি যাই হোক না কেন বার্নপুরের শ্রমিকরা যে ধীরে কাজ করার নীতি গ্রহণ করেছেন তা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।" অন্যদিকে বার্নপুর শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সমগ্র পশ্চিমবাংলার শ্রমিকশ্রেণী শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই বসে থাকেনি, শ্রমিকদের সমর্থনে এক ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করেন। বি পি টি ইউ সি-র জেনারেল কাউন্সিলের সভা থেকে বার্নপুরের শ্রমিকদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করার আবেদনে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল মিলে বার্নপুরের শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং তহবিল গঠন করা হয়। আসানসোলের ৪২টি শ্রমিক ইউনিয়ন বার্নপুর শ্রমিকদের সমর্থনে এক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। এরাও বার্নপুর শ্রমিকদের জন্য অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে কাজে নেমে পড়ে।

অন্যদিকে আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের সভাপতি মাইকেল জন ২৮শে আগস্ট সামান্য কিছু শ্রমিক নিয়ে ১৪৪ ধারা এলাকার মধ্যেই কারখানার সামনে এক সভা করে ঘোষণা করেন, শ্রমিকরা

যদি কারখানায় ফিরে গিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করে তবে মালিক তার অনুরোধে লক-আউট তুলে নেবে, আর যেহেতু জহরলাল নেহরু ও বিধান রায় অনুরোধ করেছেন তাই তিনি শীঘ্রই ইউ-নিয়নের নির্বাচন করতে রাজি আছেন। তবে প্রত্যেক শ্রমিককেই জনের ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে পুরো কাজ করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি ফর্মে সই করে দিয়ে আসতে হবে, তবেই তারা কাজ পাবে। জনের এই দালালীর জবাবে পরদিন অর্থাৎ ২৯শে আগস্ট বিশ হাজার শ্রমিকের এক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে তাদের দাবি পূরণ না হলে কারখানার দরজা খুলে দিলেও তাঁরা কাজে যাবেন না। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণী বার্নপুরের শ্রমিকদের নৈতিক সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, রাজ্যের সমস্ত শ্রমিক এলাকায় বার্নপুরের সংগ্রামী শ্রমিকদের সমর্থনে সভা-মিছিল সংগঠিত করে এবং বার্নপুরের সংগ্রামী শ্রমিকদের অ্যাকশন কমিটির কাছে অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতে থাকে।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ সাল, বার্নপুর ইস্পাত কারখানা 'ইস্কো'র মালিক লক-আউট আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে নেবার পরও অচলাবস্থা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক ছোটেলাল ব্যাস মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়, শ্রমমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী এবং পুলিশের ইনস্‌পেক্টর জেনারেলের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ সভায় আই এন টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে ডঃ মৈত্রেয়ী বসু এবং কালিপদ মুখার্জী (ছোট কালি) উপস্থিত ছিলেন।

ঐ সভায় ঠিক হয় যে পাঁচজনের ছাঁটাই নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয় সেই পাঁচজন বাইরেই থাকবে, বাকীদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক নির্বাচন ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে লেবার ডাইরেক্টরেটের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই সর্তের কোনটাই মালিকপক্ষ ও মাইকেল জন মেনে নেয় নি।

২০শে সেপ্টেম্বর এক শ্রমিক সমাবেশে ছোটেলাল ব্যাস বলেন যে ট্রাইবুনালে বিচারাধীন ৭৯ জন শ্রমিক ছাড়া সবাইকে কাজে নেওয়া হবে। আর ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বপ্রতিশ্রুতির কথা পুনরাবৃত্তি করেন। এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন এবং পরদিন থেকেই কাজে যোগ দেন। কিন্তু পরদিন কাজে যাবার পর মালিক তার নিজমূর্তি ধারণ করে। মালিক প্রায় ১৫০০ শ্রমিককে কারখানায় ঢুকতে দেয় না। উপরন্তু ইউনিয়ন নির্বাচনের ব্যাপারে ১৭,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১,০০০-এর মত শ্রমিকের সভ্যপদ রাখা হয়, বাকী শ্রমিকদের ইউনিয়নের চাঁদা দেয় নি এই অজুহাতে ইউনিয়নের সভ্যপদ বাতিল করে তাদের ভোটাধিকার হরণ করে। ঐ সমস্ত শ্রমিক সবাই চাঁদার টাকা নিয়ে ইউনিযন অফিসে গিয়ে ফিরে আসেন। কাজেই ইউনিযনের কর্মকর্তা নির্বাচনে এই সব শ্রমিকদের অংশগ্রহণে আর কোন সুযোগ থাকল না। ফলে ইউনিয়নের নির্বাচন একটি প্রহসনে পরিণত হল। কাজে যোগদানের পর কারখানার ভিতরেও কোম্পানির গুণ্ডারা শ্রমিকদের উপর নির্যাতন শুরু করে দেয়।

এত নির্যাতন, অত্যাচার এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে সহস্রাধিক শ্রমিককে কারখানায় ঢুকতে না দেওযা সত্ত্বেও মালিক-পক্ষ শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গতে পারে নি। ধর্মঘট প্রত্যাহারের একমাস পরেও শ্রমিকরা কিভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল তা দেখা যায় ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর চারশো শ্রমিক কাজের দাবিতে স্যানিটারি অফিসের সামনে সারাদিন ধরে বিক্ষোভ দেখানর মধ্য দিয়ে। মালিক বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আমদানি করে শ্রমিকদের ভয় দেখাতে আরম্ভ করে। কিছু শ্রমিককে গ্রেপ্তারও করে নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। স্যানিটারি শ্রমিকদের এই সংগ্রামের নিকট কারখানার কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত

নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। কর্তৃপক্ষ চারশো শ্রমিককেই কাজে ফিরিয়ে নেয় এবং ধৃত শ্রমিকদের মুক্তি দেয়। এই ভাবেই কারখানার ভিতরে ও বাইরে শ্রমিকরা তাদেব সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল। স্যানিটারি শ্রমিকদের এই জয় বার্নপুরেব 'ইসকো' কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

বার্নপুর কারখানার শ্রমিকদের এই লড়াই নীচুতলা থেকে ঐক্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা যোগাতে পেরেছিল, যার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই ঐ বৎসরেরই পরবর্তী সময়ে বিরাট ঐতিহাসিক বোনাস আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ।

১৯৫৩ সাল-ঐক্য ও সংগ্রামের বছর

১৯৫৩ সাল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ঐক্য ও সংগ্রামের বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বার্নপুর শ্রমিক সংগ্রামের পর ২৮শে সেপ্টেম্বর পোর্টের ত্রিশ হাজার শ্রমিক, পোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও পোর্ট মজদুর পঞ্চায়েতের যুক্ত আহ্বানে বিভিন্ন দাবিতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

ঐ বছরেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়, পূজার পূর্বে বোনাসের দাবিতে। এই প্রথম চটকলের শ্রমিকরা শুধুমাত্র বোনাসের দাবি জানিয়েই নিশ্চেষ্ট থাকে-নি ; চটকল শ্রমিকদের মধ্যে বোনাসের দাবিতে ব্যাপক জাগরণ দেখা দেয়।

১৯৫৩ সালের বোনাস আন্দোলন

বোনাসের দাবিতে ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ সালে বজবজে ত্রিশ হাজার শ্রমিকের এক বিশাল সমাবেশ হয়। তেইশ হাজার শ্রমিক ঐ এলাকায় বোনাস ব্যাজ্ ধারণ করেছিল। ঐ বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চটকল মজত্বর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী। তিনি বলেন, "আমার প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ছে। তখন চটকল আন্দোলন শুরু। কিন্তু এতবড়ো চটকল শ্রমিকের সমাবেশ আমি কখনো দেখিনি। একশত বছর ধরে চটকল শ্রমিকদের ইংরেজ মালিকরা শোষণ করে চলেছে। অন্য শিল্পে শ্রমিকরা কিছু কিছু বোনাস আদায় করতে পারলেও চটকলের শ্রমিকরা কোন দিনই বোনাস পায়নি। এবার আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে বোনাসের দাবি আদায় করব। অবিলম্বে বোনাসের দাবি না মানলে সমস্ত চটকলে একদিনের সাধারণ ধর্মঘট হবে।" প্রস্তাবটি উপস্থিত সমস্ত শ্রমিক বজ্রমুষ্টি তুলে সমর্থন করেন।

এরপর ১৩ই সেপ্টেম্বর মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক চটকল শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে পঞ্চাশটি চটকলের শ্রমিকদের নির্বাচিত ৬৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে আই এন টি ইউ সি-র অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিও ছিলেন। ঐ কনভেনশন ১৬ থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর সমস্ত কারখানায় বোনাস দাবি সপ্তাহ পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় ইণ্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের অফিস (যে অফিসটি চটকল শ্রমিকদের কাছে আলু গুদাম নামে পরিচিত ছিল) সেখানে চটকল শ্রমিকদের বৃহত্তম সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৫৩ সালের বোনাস আন্দোলন শুধুমাত্র চটকল শ্রমিকদের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য শিল্পের শ্রামক কর্মচারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ১২ই সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকরা বোনাস দিবস পালন করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গে সুতাকল শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বানে সুতাকল শ্রমিকরা বোনাস দিবস পালন করে। এর মধ্যে শ্যামনগরের ডানবার কটনমিলে বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা "স্লোডাউন" ধর্মঘট শুরু করে। অন্যান্য সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজাবাগান ডকইয়ার্ডের দেড় হাজার শ্রমিক বোনাসের দাবিতে ব্যাজ ধারণ করে।

এমনকি সুদূর পাহাড় অঞ্চলের চা-শ্রমিকদের ইউনিয়ন চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়ন এবং গোর্খা লিগ পরিচালিত ইউনিয়ন যুক্ত বিবৃতি দিয়ে বোনাস দাবি করে। উল্লেখ্য চটকল শ্রমিকদের মতো গত একশো বছরের মধ্যে চা শ্রমিকরা কখনো বোনাস দাবিও করেনি, পায়ও নি। কাজেই তাদের এই দাবি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শুধু বোনাসের দাবিই নয় এবারকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ছিল এই দাবির প্রতি ঐখানে দুটি পরস্পর বিরোধী ইউনিয়নের ঐক্য।

বোনাসের দাবি শুধুমাত্র শ্রমিকদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। ডালহৌসী স্কোয়ারে ১০ই সেপ্টেম্বর ৭৫টি ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী ও সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের দীর্ঘ দুই মাইল লম্বা এক শোভাযাত্রা বের হয়। এই বিরাট ঐক্যবদ্ধ মিছিল ময়দানে গিয়ে এক সভায় সমবেত হয়। এদের দাবি ছিল বোনাস ও ছাঁটাই বন্ধ। ঐ সভা থেকেই শপথ গ্রহণ করা হয় যে দাবি না মিটলে ধর্মঘট হবে।

ট্রাম শ্রমিকরাও একমাসের বোনাসের দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

এই পটভূমিতেই বি পি টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি ও হিন্দ

মজদুর সভা অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত-ভাবে পূজা বোনাসের দাবিতে ৩০শে সেপ্টেম্বর একদিনের সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়।

অন্যদিকে ঠিক এই সময়েই সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত কুমার বসু, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, মাখন পাল, বিভূতি ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, নীহার মুখার্জী, বিনয় চ্যাটার্জী, ডাঃ ধীরেন সেন প্রমুখ ১৮শে সেপ্টেম্বর গ্রাম ও শহর থেকে খাদ্যের দাবিতে এক ভুখা মিছিল কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে অভিযানের আহ্বান জানান।

হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চল থেকে মিছিল আসার পথে লাঠি, গুলি চালিয়ে বাধা দেওয়া হয়, এমন কি দুজন কৃষককে হত্যা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার মিছিলের অগ্রগতি রোধ করতে পারে না। লক্ষাধিক মানুষের মিছিল কলকাতার ময়দানে এসে জমায়েত হয়।

শেষ পর্যন্ত সরকারকে জনগণের কাছে নতি স্বীকার করতে হয় এবং খাদ্যের দাবি আংশিকভাবে মেনে নিতে হয়, যথা—(১) রেশন বা মডিফায়েড রেশনে চালের দাম কমিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়; (২) গ্রামাঞ্চলে দিন মজুরদের টেস্ট রিলিফের মজুরী বাড়াবার দাবিটি মেনে নেওয়া হয়; (৩) সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য এ সভাতে শুধুমাত্র খাদ্যের দাবিই নয়, শ্রমিকদের জন্য পূজা বোনাসের দাবিও ধ্বনিত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর বোনাসের দাবিতে চটকল শ্রমিকদের অভিযান বাংলা তথা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন প্রেরণা, নতুন শক্তি সৃষ্টি করেছিল।

১৩ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে চটকল শ্রমিক কনভেনশনে যে সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয় সেই অনুযায়ী চটকল শ্রমিকগণ ২৬শে সেপ্টেম্বর মালিকদের প্রধান দপ্তরে উপস্থিত হন।

সমস্ত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার শ্রমিক রয়েল এক্সচেঞ্জে মালিকদের সংঘ আই জে এম এ-র অফিসে হাজির হন। প্রচণ্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা তিনঘণ্টা দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোন মালিক উপস্থিত ছিল না, সেখানে ছিল কংগ্রেস সরকারের লাঠিধারী পুলিস বাহিনী।

আই জে এম এ-র চীফ লেবার অফিসার আর. সেনগুপ্ত শ্রমিকদের এক প্রতিনিধিদলকে জানান যে বোনাস নিয়ে যখন স্বয়ং সরকারের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে তখন শ্রমিকদের সাথে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জী এম এল এ, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিত গুপ্ত, বি পি টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রণেন সেন এম এল এ; বিনয় চট্টোপাধ্যায়, যতীন চক্রবর্তী ও অমর মজুমদারকে নিয়ে গঠিত শ্রমিক প্রতিনিধি-দল আই জে এম এ-র অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যান।

ডাঃ রায় বোনাসের মীমাংসার জন্য ট্রাইবুনালের কথা বলেন। প্রতিনিধিদল তার পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন একমাসের বোনাসের দাবি করেন। এই সময় ডাঃ রায় মালিকদের বক্তব্যই ধ্বনিত করে লোকসানের অজুহাত দেখান। প্রতিনিধিদল তথ্য ইত্যাদি দিয়ে এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেন যে আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁরা আরও তথ্য নিয়ে শ্রমিকদের দাবির যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য আবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

চটকল শ্রমিকদের বোনাসের আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রায় তিন সপ্তাহ আগে। তিন সপ্তাহের মধ্যে দেড় লক্ষাধিক

শ্রমিক প্রায় ৫০টি মিলের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বোনাস দাবি করেন।

চটকল শ্রমিকদের এই অভিযান কলকাতার নাগরিকদের মধ্যে, শ্রমিক, কর্মচারি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করে। রয়াল এক্সচেঞ্জ হতে ফিরে শ্রমিকরা ময়দানে জমায়েত হন। সেখানে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও শ্রমিকরা বঙ্কিম মুখার্জী ও ইন্দ্রজিত গুপ্তের মুখে সমস্ত আলোচনার বিবরণ শোনেন।

চটকল শ্রমিকরা ৩০শে সেপ্টেম্বর ধর্মঘট সফল করা ও বোনাসের দাবি আরও জোরদার করার সংকল্প নিয়ে ফিরে যান।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিযন কংগ্রেসের ডাকে পূজা বোনাসের দাবিতে, ছাঁটাই ও বেকারীব বিরুদ্ধে এবং খাদ্য ও বন্দীমুক্তির দাবিতে বৃহত্তর কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার ৮ লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারী ৩০শে সেপ্টেম্বর এক সাধারণ ধর্মঘট পালন করেন। বজবজ বিড়লাপুর থেকে হাজিনগর, বাঁশবেড়িয়া থেকে চেঙ্গাইল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শ্রমিক অভ্যুত্থান দেখা যায়। সমস্ত এলাকাতেই শ্রমিকরা নিজেরাই ধর্মঘটের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা তথা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সেটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ধর্মঘটের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন চটকল শ্রমিকরা। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে অধিকাংশ স্থানে বোনাস হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক সংহতির অপূর্ব উদাহরণ রেখে সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন।

বাস শ্রমিকদের বোনাসের কোন দাবি ছিল না, তবুও তাঁরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ায়। সারাদিন কলকাতার

রাস্তায় ট্রামের ও বাসের গতি স্তব্ধ ছিল। বোনাস পাওয়া সত্ত্বেও পেট্রোলিয়াম শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাকে সাড়া দিয়ে শ্রমিক ঐক্যের মহতী দৃষ্টান্ত দেখান। মেটিয়াবুরুজে হাড্ডিকল কারখানার সম্মুখে যখন চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করছিলেন তখন পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করে ও পাঁচজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মহিলা শ্রমিকরা পুলিশের ট্রাক ঘেরাও করলে পুলিশ ধৃত শ্রমিকদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণ ধর্মঘটের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ দোকান কর্মচারী, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ হরতাল পালন করেন—সহযোদ্ধা হিসাবে শ্রমিকদেব পাশাপাশি স্কুল কলেজের ছাত্ররা দাঁড়ায়। সরকার ও দালালদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে সাধারণ ধর্মঘট সফল হয়।

বিকালে তিনটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে আহুত ময়দানের জনসভায় এক লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী-মধ্যবিত্তের সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন হিন্দ-মজদুর সভার তদানীন্তন সভাপতি যতীন মিত্র। সভায় বক্তৃতা করেন হেমন্ত বসু, বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক ইন্দ্রজিত গুপ্ত, বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জী, ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক যতীন চক্রবর্তী, ইউ টি ইউ সি-র বিশ্বনাথ দুবে, ট্রাম-পঞ্চায়েতের বলিরাজ সিং, বি পি টি ইউ সি-র অজিত বিশ্বাস, বিনয় চ্যাটার্জী ও বাস-ইউনিয়নের সুজিত সিং।

সভায় ধর্মঘটী শ্রমিক কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন বক্তা বলেন যে সরকার ও মালিকপক্ষ যদি এখনও বোনাসের ন্যায্য দাবি মেনে না নেন তবে শ্রমিকরা আরো ব্যাপক ঐক্য ও সংগঠন গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সরকার ও মালিক শ্রেণীকে তাদের ন্যায্য দাবি মানতে বাধ্য করবেন।

মাহেশের বঙ্গেশ্বরী সুতাকলে ৬ই অক্টোবর সকাল ৯টা হতে বোনাসের দাবিতে এক হাজার শ্রমিক, ম্যানেজারের উপস্থিতিতে

কারখানার ভিতর অবস্থান করে। মহকুমা হাকিম এক বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য বেপরোয়া লাঠিচার্জের হুকুম দেন। ফলে ৪৫ জন শ্রমিক আহত হন। ৩২ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রমিক নেতা দীনেন ভট্টাচার্য্য ও যদুগোপাল সেনকে প্রহার করার পর গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গেশ্বরী সুতাকলে এই দমন নীতির প্রতিবাদে চার হাজার শ্রমিকের এক শোভাযাত্রা বের হয়।

এই একই দিনে অর্থাৎ ৬ই অক্টোবর ১৯৫৩, হুগলী জেলার রামপুরিয়া কটন মিল, হুগলী কটন মিল এবং হেস্টিংস জুট মিলও বোনাসের দাবিতে একই প্রকার আন্দোলন চলে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রামপুরিয়া কটন মিলে ৭০০ পুলিশের এক বিরাট বাহিনা পাঠায়। সারারাত ধরে ঐ মিলের মধ্যে পুলিশ নৃশংস-ভাবে লাঠি ও টিয়ারগ্যাস চালিয়ে বহু শ্রমিককে আহত করে। ষাট বছর বয়স্ক ভানু মিঞা ও চন্দ্রমোহন কুণ্ডু গুরুতররূপে আহত হন।

৮ই অক্টোবর রামপুরিয়া মিলে আহত শ্রমিকদের যে অসম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে আহতের সংখ্যা পৌনে দুইশ'; সাতজন শ্রমিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ৬ই অক্টো-বরের হামলার পরদিন মিল না চললেও সারাদিন মিলের বয়লারে আগুন জ্বলেছে। শ্রমিকরা খবর দেয় যে মাংস পোড়ার মত গন্ধে তারা টিকতে পারে নি; মিল অঞ্চলটি পুলিশ ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয় নি।

ঘটনার বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর তুষার চট্টোপাধ্যায় এম. পি. ও অজিত বসু এম. এল. এ. শ্রমিকদের উপর পুলিশের নৃশংস আক্রমণ ও শ্রমিকদের মৃত্যুর সংবাদ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেন। সমস্ত ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। শ্রমিকরা বোনাসের দাবি করলে এস. ডি. ও. শ্রমিকদের বলেন যে

৬ই অক্টোবর তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোনাসের মীমাংসা করবেন এবং শ্রমিকরা যেন সেইদিন মিলে উপস্থিত থাকে। সেই অনুসারে শ্রমিকরা মিলের ভিতরে অবস্থান করে। কিন্তু পুলিশ বিনা প্ররোচনায় তাদের উপর আক্রমণ করে। ঘুমন্ত শ্রমিকদের পুলিশ লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান করে ফেলে। আতঙ্কিত শ্রমিকরা মিলের পুকুরে ঝাঁপ দিলে পুলিশ তাদেরও নির্দয়ভাবে প্রহার করে। একজন মহিলাশ্রমিক পরদিন সকালে পুলিশকে পুকুর থেকে দুটি মৃতদেহ তুলতে দেখেছে বলে জানায়।

বঙ্গেশ্বরী সুতাকলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ৩০ জনের নামে একটি ও ৩ জনের নামে আর একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। এই তিনজন হলেন হুগলীর শ্রমিকনেতা দীনেন ভট্টাচার্য, যদুগোপাল সেন ও ইন্দু সোম।

রামপুরিয়া মিলেও ১০৬ জনের নামে পুলিশ ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। মনোরঞ্জন হাজরা এম. এল. এ.-কে গ্রেপ্তার করে ও অন্যান্য শ্রমিকনেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাসী চালায়। এই সময়ে বাসন্তী কটন মিলের শ্রমিকরা বোনাসের দাবিতে অনশন ধর্মঘট ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালান।

৩০শে সেপ্টেম্বর বোনাসের দাবিতে সারা পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটের পর মালিকপক্ষ ও সরকার ক্ষিপ্তের মত ইতস্ততঃ শ্রমিকদের উপর আক্রমণ শুরু করে। বহু কারখানায় লক-আউট ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনই রাতে বেহালা ক্লাইড ফ্যান কারখানায় লক-আউট ঘোষণা করা হয়। এক লরী পুলিশ নিয়ে মালিকপক্ষ কারখানার মাল সরানোর চেষ্টা করে। নিরুপায় শ্রমিকরা মালভর্তি লরীর সামনে শুয়ে পড়ে। তখন পুলিশ তাদের বেপরোয়া প্রহার করে ও শেষ পর্যন্ত গুলি চালায়। শ্রমিকদের সমর্থনে এলাকার মানুষ ব্যারিকেড সৃষ্টি করে বিরাট জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

বি পি টি ইউ সি-র সহঃ সভাপতি বিনয় চ্যাটার্জী, সহঃ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায় ও অম্বিকা চক্রবর্তী এম. এল. এ. ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং দলমত নির্বিশেষে এই দমননীতির প্রতিবাদে জনসমাবেশ করতে আহ্বান জানান।

অন্যদিকে ধর্মঘটে যোগদানের অপরাধে স্টেট বাসের প্রায় সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। ১লা অক্টোবর বরখাস্তের প্রতিবাদে বি পি টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি, ও হিন্দ মজদুর সভার যুক্ত আহ্বানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্টেট বাস শ্রমিক কর্মচারীদের এক সমাবেশে জনগণকে স্টেট বাস বয়কটের আহ্বান জানান হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় শ্রমিক কর্মচারীদের উপর কোন প্রকার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিলে বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু কর্মচারীরা যখন কাজে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। এইভাবে ২৩শে অক্টোবর ড্রাইভার জীবন ঘোষালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার আগে আরো ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইউনিয়নের নেতা রমেন ব্যানার্জী ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

সরকারই যখন স্টেট বাসের কর্মচারীদের সাসংপেণ্ড করে পথ দেখিয়ে দিল তখন ব্যক্তিগত মালিকরা যে সরকার প্রদর্শিত পথে যাবে সেটা নিশ্চিত ছিল। ক্লাইভ জুটমিল, ফিনিক্স ফ্যান কারখানা, প্রেম হোসিয়ারী কারখানা, স্টিল প্রোডাক্টস্ কারখানা, জি. ম্যাকেঞ্জী মোটর কারখানা, আসাম বেঙ্গল ভিনিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ, নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিল, হুকুমচাঁদ জুট মিল সহ ছোট বড় বহু কারখানায় লক-আউট ঘোষণা করা হয়। মোহিনী মিল সহ অন্য কিছু কিছু কারখানায় মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ভবিষ্যতে ধর্মঘটে যোগ না দেবার জন্য দাসখতে সই দেবার দাবি জানায়। নিউ

সেন্ট্রাল জুটমিলে পুলিশ লাঠি চালিয়ে ও কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে ৪ জন মহিলাসহ ৬ জনকে আহত করে।

৮ই অক্টোবর হাজি নগর হুকুমচাঁদ জুটমিলের মহিলা শ্রমিকরা বোনাসের দাবি নিয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টর দেবীদাস গোয়েংকার কাছে গেলে তিনি বোনাসের দাবি মানতে অস্বীকার করেন। মহিলা শ্রমিকরা অফিসের সামনে চুপচাপ বসে থাকেন। সন্ধ্যা ৬ টায় কোনরূপ হুঁশিয়ারী না দিয়েই পুলিশ বাহিনী একবার লাঠি চার্জ করে। কর্তৃপক্ষ রাত্রি আটটায় লক আউট ঘোষণা করে। রাত সাড়ে আটটায় সমস্ত মিলগেট বন্ধ করে কোনরূপ সতর্কতা না দিয়েই শান্তিপূর্ণ মহিলা শ্রমিকদের উপর পুনরায় লাঠি চার্জ করে ও টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সহঃ সম্পাদক নীরেন ঘোষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দাবি, লক-আউট প্রত্যাহার এবং ধৃত শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের মুক্তি দাবি করেন। এরপর বি পি টি ইউ সি-র সভাপতি সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী এম. পি. এবং বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জী, এম. এল. এ. এক যুক্ত বিবৃতিতে পুলিশের বিনা প্ররোচনায় নারী শ্রমিকদের উপর লাঠি চার্জের তীব্র নিন্দা করেন। ৯ জন শ্রমিকের উপর যে ছাঁটাই-এর নোটিশ দেওয়া হয় তা প্রত্যাহার করে শ্রমিকদের বোনাসের ন্যায্য দাবি স্বীকৃতি দিয়ে সরকারের কাছে অবিলম্বে লক-আউট প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে অত্যাচারিত ও দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের সাহায্যে যথাসাধ্য দান করার জন্য আবেদন জানান। টাকা পয়সা বি পি টি ইউ সি-এর অফিস ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রীটে পাঠাবার নির্দেশ দেন। ৩১শে অক্টোবর পূর্ববর্তী নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল দশটায় তদানীন্তন রাজ্য শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জীর (বড় কালী)•"সঙ্গে বি পি টি ইউ সি-র সভাপতি সত্যপ্রিয়

ব্যানার্জী এম. পি. এবং সহঃ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায় হুকুমচাঁদ জুটমিলে লক-আউট তুলে নেবার বিষয়ে আলোচনার জন্য তার বাসস্থানে দেখা করতে যান। শ্রমমন্ত্রী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঐ কারখানার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় দুঘণ্টা আলোচনা করেন। যখন খুব ভালভাবেই আলোচনা চলছিল এবং শ্রমমন্ত্রী সহানুভূতির ভাব দেখিয়ে সমস্ত ব্যাপার বিবেচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই হুকুমচাঁদ জুট মিলের গেটে বিরাট পুলিশ বাহিনী জমায়েত হয় এবং হুগলী নদীর ওপারের জুট-মিলগুলো থেকে বদলী শ্রমিকদের নিয়ে আসে। প্রথমে হুকুমচাঁদের গেটে পাহারারত ভলান্টিয়ার শ্রমিকদেব উপর লাঠি চার্জ করে তাদের সরিয়ে দেয় এবং তারপর ঐ ভাড়াটে শ্রমিকদের দিয়ে কারখানা চালু করে দেয়। ষড়যন্ত্রটি যে আগেই হয়েছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি সত্যপ্রিয় বাবু ও মনোরঞ্জন রায় শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর আশান্বিত হয়েছিলেন যে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বি পি টি ইউ সি-র অফিসে গিয়ে জানলেন যে ঐ সময়েই হুকুমচাঁদ মিলের গেটে তাণ্ডব চলছিল এবং উপরোক্ত নয়জন শ্রমিক ছাড়াও আরো অনেক শ্রমিককে ছাঁটাই করে দিয়ে তারা লক-আউট প্রত্যাহার করে নেয়।

১৫ই অক্টোবর কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারী ও শ্রমিকদের ১১টি সংগঠনের যুক্ত কমিটির নেতৃত্বে ১৫ হাজার শ্রমিক কেন্দ্রীয় কর্পোরেশনের দপ্তরে মেয়র নরেশ মুখার্জীর কাছে এক গণ-ডেপুটেশনে যান। তাদের দাবিগুলি ছিল—(১) পূজার পূর্বে ১২ কিস্তিতে শোধযোগ্য ১ মাসের মাইনে অগ্রিম দিতে হবে, (২) অন্তবর্তী রিলিফ হিসাবে মাথাপিছু ১০ টাকা হিসাবে দিতে হবে প্রভৃতি। মেয়র প্রথমে প্রতিনিধিদের জানান যে তাদের দাবি পূরণ করা অসম্ভব। কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীরা বিকাল পাঁচটা থেকে অধিক রাত পর্যন্ত অবস্থান করলে মেয়র তাদের দাবিগুলিকে

পুনর্বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিলে অবস্থান তুলে নেওয়া হয়।

অন্যদিকে বোনাস আদায়ের সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তার আগে একবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবার সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেন। ৪ঠা অক্টোবর পশ্চিমবাংলার ৭০টি চটকলের ৩ লক্ষ শ্রমিকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও মিল ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল বি পি টি ইউ সি-র আহ্বানে এক সভায় মিলিত হন এবং ১০ই অক্টোবর চটকল মজদুরদের একটি গণ-ডেপুটেশন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে স্থির হয়। ১০ই অক্টোবর ময়দানে সত্যপ্রিয় ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে ১৫ হাজার শ্রমিকের এক সভা হয়। এই সভায় হুকুমচাঁদ জুটমিলের দুইজন নারী শ্রমিকও আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁরা পুলিশী আক্রমণের সাক্ষীস্বরূপ প্রচুর টিয়ার গ্যাস সেল সভায় উপস্থিত করেন। এই সভায় ১২ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ১৬ জনের একটি প্রতিনিধি-দল গঠিত হয়।

১২ই অক্টোবর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ডাঃ রায় স্বীকার করেন যে মিল মালিকদের বোনাস দেবার ক্ষমতা আছে এবং মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য তিনি ১৩ই অক্টোবর বিকাল পর্যন্ত সময় নেন। ধর্মঘটের প্রস্তুতিও চলতে থাকে। পরবর্তীকালে ধর্মঘট করা সম্ভব হয় নি। বোনাস আদায় না হলেও চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন সারা বছর ধরে চলতে থাকে।

ট্রাম শ্রমিকরা দীর্ঘ আন্দোলনের পরও যখন বিলাতি ট্রাম কোম্পানী ও কংগ্রেসী সরকার বোনাসের দাবি মানল না তখন শ্রমিকরা আবার ধর্মঘটের পথে যাবার জন্য মনস্থির করেন। অবশেষে মালিক ও সরকার বোনাসের দাবী মেনে নেন। ট্রাম কোম্পানীকে মাথা নত করিয়ে এবং তাদের বশংবদ কংগ্রেসী

সরকারের দীর্ঘ টালবাহানা ব্যর্থ করে কলকাতার বাহাত্তুর ট্রাম-শ্রমিকরা তাদের বোনাসের দাবি আদায় করেন। দাবি আদায়ের পর ১৫ই অক্টোবর সর্বসম্মতভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে বিজয়ী ট্রামশ্রমিকরা নিজেদের রক্তেরাঙা 'লাল ঝাণ্ডা' ও মজতুর পঞ্চায়েতের ঝাণ্ডা উড়িয়ে বিজয় গর্বে বেলা সাড়ে ১০ টায় ট্রাম চালু করেন। রাস্তার তুই পার্শ্বে চলমান জনতা উল্লাস ধ্বনি করে শ্রমিকদের অভিনন্দন জানান। শ্রমিক ও জনতার ঐক্যের এক অপূর্ব দৃশ্য রাস্তায় ফুটে ওঠে।

শ্রমিক-কর্মচারীরা নিজেদের ঐক্যের জোরে সেবার বহু স্থানে আংশিক হলেও বোনাস আদায় করেন। বেহালার ইণ্ডিয়া ফ্যান কোম্পানীর আড়াই হাজার শ্রমিক ও সাড়ে চারশত কর্মচারী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জোরে দেড় মাসের পূজাবোনাস আদায় করেন। একইভাবে বেহালার ভারত ফ্যানের শ্রমিক-কর্মচারীরা দেড় মাসের বোনাস পান। বেহালার ছোট কারখানা মেহরা ব্রাদার্সের শ্রমিকরা ৭ দিনের বোনাস আদায় করেন। ঘুসুড়ীর ভিক্টোরিয়া কটন মিলের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা বোনাস আদায় করেছেন। উল্লেখ্য, সেখানে মালিকপক্ষ বোনাস দেবার ব্যাপারে তারতম্য করে বিভেদ স্বষ্টি করার চেষ্টা করে কিন্তু শ্রমিক ঐক্যর কাছে তা ব্যর্থ হয়। একই ভাবে রেকিট ও কোলম্যান কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারীরা, মেদিনীপুর বিজলী শ্রমিকরা, ইস্টার্ন ব্যাংকের কর্মচারীরাসহ বহু ছোট বড় কারখানায় সেবার বোনাস আদায় সম্ভব হয়েছিল।

১৯৫৩ সালে আগস্ট মাসে তদানীন্তন পি এস পি পরিচালিত ওয়েস্টবেঙ্গল চা শ্রমিক ইউনিয়ন বেতন বৃদ্ধির দাবিতে জলপাই-গুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে তিন দিনের লাগাতার ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। চা-শিল্পও তখন মাত্র মনুষ্য সৃষ্ট সংকট থেকে উদ্ধার পেয়ে চায়ের মূল্য বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, ঐ অবস্থায় এবং

বিশেষ করে বি পি টি ইউ সি ইউনিয়নের সঙ্গে শ্রমিকদের দাবির ব্যাপারে এই ইউনিয়নের সাথে অনৈক্য থাকার ফলে প্রথম দিকে ঐ ধর্মঘটে বি পি টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে শ্রমিকদের যোগ দিতে বলা হয় নি। পরের দিকে এ আই টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের ফলে বি পি টি ইউ সি-র ইউনিয়ন জেলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নও ঐ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানায়।

কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় দার্জিলিং গিয়েছিলেন। সেখানে ১১ই অক্টোবর পুলিশের বাধা সত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হাজার হাজার চা-শ্রমিক শহরে জমায়েত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় শেষ পর্যন্ত রতনলাল ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি মেনে নেন :—

(১) জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানের সমান করে দার্জিলিং-এর চা-শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানো হবে।

(২) চা-পাতা তোলা সামান্য কম হলে মাগ্‌গীভাতা কাটার প্রথা বন্ধ করা হবে।

(৩) পরিবারের কর্তাকে বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অন্যান্যদের বরখাস্ত করার প্রথা বন্ধ করা হবে।

(৪) বাগানের শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, যক্ষ্মা রোগীর বিনামূল্যে এক্স-রে এবং কয়েক মাইল দূরে দূরে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে।

(৫) চা-বাগান ও অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীর বোনাসের দাবি ট্রাইব্যুনালে দেওয়া হবে।

(৬) ছোট ছোট শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করা হবে।

(৭) দার্জিলিং জেলার ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনয়ন করার পদ্ধতির অবসান করা হবে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে একটি প্রতিশ্রুতিও ডাঃ বিধান রায় পালন করেন নি। যার ফলে ১৯৫৫ সালে দার্জিলিং-এর শ্রমিকরা এক ঐক্যবদ্ধ রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিল। তার ইতিহাস ১৯৫৫ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস লেখার সময় দেওযা হবে।

ঐ বৎসরই আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো টিটাগড় পেপার মিলের কাকিনাড়ার দুই নম্বর কারখানায তিনমাস ব্যাপী বেতন বৃদ্ধি, বোনাস প্রভৃতির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট। ১৯৫৩ সালের শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘটের কোন মীমাংসা হয নি, ধর্মঘট চলতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫৩ সালটি ছিল ঐক্য ও সংগ্রামে উত্তাল একটি বছর। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ছাঁটাই ও বেকারী বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সে আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করল এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানে এবং যার পরিসমাপ্তি ঘটল লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী বোনাস আন্দোলনে।

১৯৪৮-৪৯ সালে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫৩ সালের আন্দোলন তার অনেকটাই ধুয়ে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ঐক্য এবং সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই শ্লোগান শ্রমিকশ্রেণীর মুখে মুখে ধ্বনিত হতে থাকে। তাই ১৯৫৩ সালকে বলা চলে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের ঐক্য ও সংগ্রামের বছর।

১৯৫৩ সালের তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের জের হিসাবে ১৯৫৪ সালের শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন তদানীন্তনকালের শ্রমিক আন্দোলনকে আরো এক ধাপ উঁচুতে তুলে ধরে। শিক্ষকদের এই আন্দোলনের বিশদ বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এই আন্দোলনের সময়ও কংগ্রেস সরকার নির্বিচারে লাঠি, গুলি চালিয়ে এবং

নির্বিচারে জেলে পুরে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বারবারই কংগ্রেস সরকারকে শ্রমিকশ্রেণী তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে পরাজয় বরণ কবতে হয়। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সরকারকে একইভাবে জনসাধারণের কাছে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতে হয়।

১৯৫৫ সাল শুরু হয় বাঁশবেড়িয়ার গ্যাঞ্জেস চটকলের শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার মধ্য দিয়ে। পাচজন নারী শ্রমিকের ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। বাঁশবেড়িয়া বাজারের কাছে একটি শ্রমিকদের সভায় পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে একজন শ্রমিক ও একজন দোকানদারকে হত্যা করে এবং বহু শ্রমিক এই গুলি চালনার ফলে আহত হন। এরপরই চলে নির্বিচারে গ্রেপ্তার। চটকল শ্রমিকদের ১৯৫৩ সালের আন্দোলনের পর আবার ১৯৫৫ সালের প্রথমদিকে শ্রমিকদের উপর গুলি চললো। কিন্তু এর প্রতিবাদে সেদিন অন্যান্য চটকলে শ্রমিকরা এগিয়ে আসতে পারেন নি। এটা ছিল সেদিনকার চটকল শ্রমিকদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও একতার অভাবের পরিচায়ক।

৬

শ্রমিক ঐক্যের নূতন অধ্যায়

১৯৫৫ সাল উত্তরবঙ্গের চা-বাগান শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমিক ঐক্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। দার্জিলিং এর পাহাড় অঞ্চলে ১৯৫২-৫৩ সালে রেশনের দাম বাড়িয়ে শ্রমিকদের বেতন শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। '৫২ সালের সমস্ত শীতের সময় একের পর এক বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে বাগানগুলো খোলা ছিল সেখানেও সপ্তাহে পাঁচ দিনের বেশি কাজ দেওয়া হত না। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সেদিন শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ মালিকপক্ষ এবং সরকার পুরোপুরি নিয়েছিল। এই অনৈক্য থাকার ফলে মালিক ও সরকারের আক্রমণের মুখে শ্রমিকরা অসহায় বোধ করছিল। এটা সবারই জানা আছে যে শ্রমিকরা কখনোই নিজেরা নিজেদের পথের নিশানা তৈরী করে নিতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় উপরতলার নেতৃত্বের সাহায্য। শ্রমিকরা মনে মনে উপলব্ধি করলেও ঐক্যের প্রশ্নটি তুলে ধরা কিংবা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ঐক্য গড়ে তোলার দায়িত্ব হ'ল নেতৃত্বের। এই অবস্থায় বি পি টি ইউ সি-র নেতৃত্ব চা-বাগানের এই অনৈক্যের অবসানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেন এবং শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন এবং স্থানীয় নেপালীদের সংগঠন গুর্খালীগের পরিচালিত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য গড়ে ওঠে। এই ঐক্য সেদিন ছিল অভূতপূর্ব এবং অচিন্তনীয়। কারণ গুর্খালীগ ও কমিউ-

নিস্টদের সঙ্গে তখন ছিল শত্রুতামূলক সম্পর্ক, সেই অবস্থার মধ্যে গুর্খালীগ পরিচালিত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলে যৌথ নেতৃত্বে চা-শ্রমিকদের আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল কমিউনিস্ট কর্মীদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি এবং সেটা কার্য্যকরী করার জন্য লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে।

এই ঐক্যের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ২২শে জুন থেকে সমস্ত দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে সমস্ত চা-বাগানগুলির শ্রমিকদের লাগাতার সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়।

এইখানে ১৯৫৫ সালে মনোরঞ্জন রায় কর্তৃক লিখিত "দার্জিলিং-এ ঐক্য ও সংগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা: ঐক্য প্রয়োজন—১৯৫২-৫৩ সালে যখন চায়ের দাম পড়ে গেছে এই অজুহাতে বেশ কয়েকটি চা-বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখনকার অনাহার আর অনাহারজনিত মৃত্যুর তিক্ততম অভিজ্ঞতা দার্জিলিং-এর শ্রমিকদের আছে। তারা দেখে নিয়েছে, কিভাবে সেই সরকার, যে সরকার জনগণের সরকার বলে নিজেদের দাবি করে থাকে, অভুক্ত শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসার বদলে দানবীয় মজুরী ছাঁটাই করেছে। তারা দেখেছে শীতের সময়ে যখন বাগিচা মালিকরা সহজেই বাগান বন্ধ রাখতে পারে, কিভাবে বাগান বন্ধ রেখে শতশত শ্রমিককে ক্ষুধার মুখে ঠেলে দিয়েছে, আর একবারও সরকার শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। সর্বোপরি তারা এও দেখেছে যে, কিভাবে মালিকরা সবসময়েই শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নিয়েছে, যখন মালিকরা আক্রমণ চালিয়েছে, শ্রমিকরা নিজেদের অনৈক্যের কারণে তাদের সাহায্য করেছে।

"তাই দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রমিকরা তাদের নিজেদের

অভিজ্ঞতায় শিখেছে যে, তাদের নিজেদের দাবিগুলি আদায় করতে হলে ঐক্য বিনা আশা নাই।

"এ আই টি ইউ সি অনুমোদিত দার্জিলিং চিয়াকামান মজদুর ইউনিয়দের জন্ম হয় ১৯৪৫ সাল নাগাদ। কিন্তু ১৯৪৮-৫১-র অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে ইউনিয়ন যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৫৩ থেকে ধীরে ধীরে বাগানের শ্রমিকদের আশু সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক সংগ্রাম করে আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদেব গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলিকে জয়যুক্ত করাব জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালিত করার মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি। পরবর্তী সময়ে গোর্খালীগের নেতৃত্বে আর একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন ময়দানে অবতীর্ণ হয়। পাহাড়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ইউনিয়নের প্রভাব আছে। তা ছাড়াও চা-শ্রমিকদের একটা বৃহৎ অংশও এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এ আই টি ইউ সি অনুমোদিত দার্জিলিং জেলাচিয়া কামান মজদুর ইউনিয়ন দার্জিলিং-এর চা-বাগান শ্রমিকদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৫৩ সালেই অপর ইউনিয়নটির নেতৃত্বের কাছে ঐক্যের প্রস্তাব করেন।

"কিন্তু দুটি ইউনিয়নের নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। কাজেই—প্রথমে বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও সফল হওয়া ছিল এক বিশাল সমস্যা। এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধৈর্য সহকারে দু-বছর ধরে সমানে ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ক্ষতিকারক সমালোচনা, যা একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা বলে গণ্য হতে পারে, সে সব পরিত্যাগ করে যৌথ দাবি-সনদ প্রস্তুত ও যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার ইতিবাচক পথে এগোনো গেল। শেষ পর্যন্ত জীবনের অভিজ্ঞতাই দুটি ইউনিয়নের সদস্য ও সমর্থকদের শিক্ষা দিল। চৌদ্দ দফা যুক্ত দাবি সনদ তৈরী হোল। মে মাসে মালিক পক্ষ ও সরকারকে দুটি ইউনিয়নই চরমপত্র দিল।

"এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐক্যের শর্ত ছিল কোন ইউনিয়নই যৌথ সভায় পতাকা ব্যবহার করবে না অথবা 'জয় গুর্খা' বা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেওয়া হবে না। সরকার ও মালিকপক্ষ এ জিনিষকে খুব হালকা ভাবেই নিয়েছিল এবং নির্ভর করেছিল শ্রমিকদের অনৈক্যের ওপর। অবশেষে ৫ই জুন ছুটি ইউনিয়নের যৌথ সভা থেকে সাধারণ ধর্মঘটের দিন ঘোষিত হোল। সরকার তবুও নিষ্ক্রিয় রইল।

"৬ই জুন থেকে প্রতিটি চা-বাগানে যৌথ সভা ও মিছিল শুরু হল। এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ছুটি ইউনিয়ন—বাগানে যুক্ত ধর্মঘট কমিটি গঠিত হোল। তারা তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথমবার শক্তিশালী বৃটিশ চা-মালিকদের মোকাবিলা কবার মতো শক্তি অর্জনের আত্মবিশ্বাস অর্জন করল।

"সরকারের আক্রমণ :—সরকার এবং চা-মালিকরা শ্রমিকদের ঐক্যের শক্তিকে ছোট করে দেখেছিল। তাদের ধারনা ছিল কয়েকশো শ্রমিককে গ্রেপ্তার আর বাগানে বাগানে পুলিশ মোতায়েন করলেই শ্রমিকরা ভয় পাবে। আর তার পরও যদি ধর্মঘট হয়, ছু-তিন দিনের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়বে। তাছাড়া কি সরকার, কি মালিক পক্ষ ভাবতেই পারেনি যে, ধর্মঘট দাবানলের মতো বাগানে বাগানে ছড়িয়ে পড়বে, এমন কি অসংগঠিত বাগান-গুলিও বাদ যাবে না।

"সরকার প্রথমে হুমকী দিল যে, ধর্মঘট বে-আইনি ঘোষণা করা হবে। অজুহাত হোল সস্তাদরে কাপড় সরবরাহ ও আর একটি বিষয় নিয়ে একটা শ্রমবিরোধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আছে। এই বিষয়টা গত ছ'বছর ধরে বিচারাধীন আছে, আব এই অবস্থাতেই বিভিন্ন বাগানে মালিকরা অন্ততঃ ১০৪ জনকে ছাঁটাই করেছে (এ হিসাব কেবল একটি ইউনিয়নেরই)। প্রতিবারই

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের নজরে এই বিরোধ ও বে-আইনি বিষয়গুলো আনা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে সরকার এতদিন সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল। আর এবার এই শ্রমবিরোধের অজুহাতেই সরকার শ্রমিকদের এই ধর্মঘট বে-আইনী করার হুমকী দিলেন।

"এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কি পুঁজি বিনিয়োগে, কি বাগানের আয়তনে, কি বাগানের সংখ্যায় দার্জিলিং-এ বৃটিশ স্বার্থই প্রধান। যদিও একেবারে সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি বাগানের মালিকানা বদল হয়েছে। তবুও এখনও চা-বাগিচার সমগ্র আয়তনের সত্তর ভাগ বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন। সুতরাং প্রধানতঃ বৃটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষার্থে কংগ্রেস সরকার এই পাহাড়ী অঞ্চলটিতে বিপুল সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করলো। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে কলকাতা থেকে এখানে এনে বাগানে বাগানে মোতায়েন করা হোল। এসব দমন মূলক বন্দোবস্ত সত্ত্বেও ধর্মঘট নির্ধারিত দিনে—২২শে জুন শুরু হোল। বাষট্টিটি বাগানের মোট চল্লিশ হাজার শ্রমিক এই আটদিন-ব্যাপী ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন।

"নীচুতলার শ্রমিকদের উদ্যোগ :—শ্রমিক ঐক্য কেবল উদ্দীপনাই আনে নি, নীচুতলার শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত নেতারা হয় গ্রেপ্তার, নয় আত্মগোপন করার ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ এই পাহাড়ি অঞ্চলের পথঘাট দুর্গম হবার জন্য। কিন্তু নীচুতলার শ্রমিকদের কাছে কোন বাধাই প্রতিবন্ধক ছিল না। বিশেষ উদ্যোগ ও সাহসিকতা দেখা গিয়েছিল নারী শ্রমিকদের মধ্যে। পনের থেকে কুড়ি বছরের মেয়েরা পায়ে হেঁটে বাগান থেকে বাগানে গিয়েছিল এবং নিজেদের বাগান থেকে তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরের বাগানে গ্রেপ্তারও হয়েছিল। নারী-স্বেচ্ছাসেবকরা পুরুষদের পাশাপাশি সমান কাজ করেছে এবং কোন কষ্টই তাদের

ঘুমাতে পারে নি। ধর্মঘট চলাকালীন পুরা সময় শ্রমিক সঙ্ঘ (গুর্খা লীগ পরিচালিত) ও মজদুর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকরা ও বাগানের নেতারা যৌথভাবে কাজ করেছেন এবং এভাবেই সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন।"

দার্জিলিং পাহাড়ের চা শ্রমিকদের মজুরী

১৯৫৩ সাল থেকেই দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রমিকরা দাবি করে আসছিল যে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা-বাগিচার বেতন কাঠামো একই করতে হবে। দার্জিলিং পাহাড়ের পাদদেশেই অবস্থিত ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বেতন কাঠামোও খুব কম ছিল, কিন্তু ডুয়ার্স ও তরাইয়ের শ্রমিকরা যা পেত দার্জিলিং-এর শ্রমিকরা তাও পেত না।

ন্যূনতম বেতন আইনের অধীনে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সময় কমিটি নিজেই দেখেছিল যে দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাই-এর জীবন ধারণের মূল্যস্তর প্রায় একই। বরং অপর দুই এলাকার চেয়ে দার্জিলিং-এর মূল্যস্তর একটু বেশীই ছিল। তাই মোদক কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিলেন যে ডুয়ার্স, তরাই ও দার্জিলিং-এর বেতন কাঠামো একই হওয়া উচিত। কিন্তু সুপারিশ দেবার সময় এই কমিটি কোন কারণ না দেখিয়েই হঠাৎই বলে বসল যে, দার্জিলিং-এর শ্রমিকরা ডুয়ার্স ও তরাই-এর শ্রমিকদের চেয়ে চার আনা রোজ কম পাবে। এটা হোল ১৯৫১ সালের কথা।

তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একতরফাভাবে ডুয়ার্স ও তরাই-এর সঙ্গে দার্জিলিং চা শ্রমিকদের পার্থক্য বাড়িয়ে চলছিল। ধর্মঘটের নোটিশ দেবার সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের জুন মাসে, তরাই ও ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের বেতনের রূপ পরের পাতায় দেওয়া হোল।

	পুরুষ	নারী	শিশু
	টা-আ-প	টা-আ-প	টা-আ-প
দার্জিলিং পাহাড়	১-২-৬	১-১-৬	০-১১-৬
তরাই	১-১১-০	১-৯-০	১-২-০
ডুয়ার্স [পাঁচশো একরের বেশি এলাকার বাগান]	১-১১-৬	১-৯-৬	১-২-৬

সুতরাং দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের শ্রমিকদের বেতনের তফাৎ ছিল প্রতিরোজ নয় আনা।

সরকারের মতানুযায়ী দার্জিলিং ছিল অল্প উৎপাদনোপযোগী এলাকা। সুতরাং মালিকরা বেশী মজুরী দিতে পারবে না এবং শ্রমিকদের উচিত যা পাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। এই একই যুক্তিতে ১৯৫২-র ডিসেম্বরে যখন চায়ের বাজার দর পড়ে গেল তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিং-এর চা-শ্রমিকদের বেতন হ্রাসের প্রথম বলি করল। সুতরাং সরকার চাইল ন্যূনতম মজুরীর নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে—মজুরী হবে প্রতি একরে উৎপাদন ও প্রতি পাউণ্ড চায়ের দাম অনুযায়ী। বলা বাহুল্য, এ হোল ন্যূনতম মজুরী আইনের মূল লক্ষ্য ও নীতিরই পরিপন্থী।

সঠিকভাবে বলতে গেলে, দার্জিলিং পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের সংগ্রাম ছিল ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন ও দাম অনুযায়ী ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ব্যাপক হারে যক্ষ্মা

সাধারণভাবে চা-শ্রমিকদের চূড়ান্ত কষ্টভোগ করতে হোত, বিশেষতঃ প্রতি বর্ষাকালে, যা পার্বত্য অঞ্চলে হয় দীর্ঘস্থায়ী। পাহাড়ী দুর্গমতার জন্য দার্জিলিং-এর শ্রমিকদের অন্য অঞ্চলগুলির চেয়ে বেশী কষ্ট ভোগ করতে হোত। স্বাভাবিকভাবেই তাদের

প্রয়োজন ছিল ভালো আহার ও কাপড়-চোপড়, যাতে প্রবল শীতের কামড় তারা মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের কাছে এসবের কোন গুরুত্ব ছিল না। তাদের একমাত্র গুরুত্বের বিষয় ছিল মুনাফা—বিশেষ করে বৃটিশ মালিকদের। দার্জিলিং এর শ্রমিকদের কঠিন পরিশ্রম ও অত্যন্ত নীচু জীবনযাত্রার মানই তাদের মধ্যে উচ্চহারে যক্ষ্মার মূল কারণ ছিল।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের অ্যাডিশনাল ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল মেজর ইলয়েড জোনস ভারতের চা-বাগানগুলিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান সম্পর্কে তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন—"দার্জিলিং চা-বাগিচা এলাকায় স্বাস্থ্যের মূল সমস্যা হোল যক্ষ্মা। এটাই এই এলাকায় ডাক্তার ও বাগিচা মালিকদের উদ্বেগের কারণ... বিশেষত দার্জিলিং এলাকায় যক্ষ্মা রোগের মৃত্যুর ক্রমবর্ধমান হার সত্যিই উদ্বেগজনক।" (রেগী কমিশনের রিপোর্ট হইতে গৃহীত)।

কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গঠনে ব্যস্ত কংগ্রেস সরকারের কাছে এসব বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার আশা করা যায় না; তাদের বৃটিশ ও ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখতে হবে, যারা একাই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গঠনে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং শ্রমিকদের দাবিতে কর্ণপাত করা হোল না। ১৯৫৫ সালেও চা-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অস্বীকৃত হচ্ছিল। যদিও বাগিচা শ্রমিক আইন বহিরাগতদের বাগানে ঢোকার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল তবুও ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠকদের অনধিকার প্রবেশের দায়ে তখনও গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল।

স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার ও বোনাস

সকলেই জানেন যে, চা-বাগিচা এলাকায়, যেখানে শতশত মাইল এলাকা চা বাগিচা মালিকদের, যেখানে ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারত না, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ ছিল। কঠিন বাধার মধ্যেও সেইসময় চা-শ্রমিকরা ধীরে ধীরে ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হচ্ছিল। যখন বাগিচা মালিকরা শ্রমিকদের ইউনিয়নে যোগ দেওয়া আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন তারা ঘৃনিত স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সাহায্য নিয়ে কোন না কোন অজুহাতে সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন নেতাদের ছাঁটাই করেছে আর সপরিবারে তাদের বাগান ছাড়া করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চা-বাগানের অন্যতম দাবী ছিল স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধন, যে স্ট্যাণ্ডিংঅর্ডার মালিকদের যখন খুশী ছাঁটাই করার অধিকার দিয়েছিল।

সেই সময় দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাই-এর সমস্ত চা-শ্রমিকদের আরেকটি সাধারণ দাবি ছিল বোনাস। ১৯৫৩—৫৪ সালের চায়ের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সঙ্গে মালিকদের অভূতপূর্ব মুনাফা শ্রমিকদের অজানা ছিল না। তারা আর নিজেদের অমানবিক জীবনযাত্রার মানে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী ছিল না। আগেকার পশ্চাৎপদ চা-শ্রমিকের চেতনা সেদিন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, বৃদ্ধি পেয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতাও। তাই তারা সেদিন সরকার ও মালিকদের তাদের বোনাসের দাবি মানতে বাধ্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

দার্জিলিং-এর চা-শ্রমিকরা আরো যেসব দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছিল, তার মধ্যে ছিল বাগানের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, ১৯৫৩ সালের বেতন ছাঁটাই-এর ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি।

যদি আমরা দার্জিলিং পাহাড়ের বাগানগুলির ঐ সময়কার মূল্য, মুনাফা ও কাজের জন্য ব্যয় ইত্যাদি খতিয়ে দেখি, আমরা দেখতে পাব কি রকম নির্লজ্জভাবে কংগ্রেস সরকার ইতিমধ্যেই ইংরাজ মালিকদের ক্রমবর্ধমান মুনাফার হার আরো বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের চাপ দিচ্ছিল।

নিচের চিত্র থেকে দেখা যাবে চায়ের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এ ঘটনাও দেখা যাবে যে, যেখানে দার্জিলিং-এর চায়ের দাম সব সময়েই বেশী, সেখানে একই সংগে প্রতি একরে ব্যয় দার্জিলিংয়েই সবচেয়ে কম ছিল। সরকার ও বাগিচা-মালিকরা নিজেদের সুবিধামত এসব কথা চেপে রাখত এবং চেষ্টা করত সাধারণ মানুষকে এই যুক্তি দিয়ে বিভ্রান্ত করতে যে, এখানেই প্রতি একরে ফলন সবচেয়ে কম।

রপ্তানী মূল্য (কলিকাতা নীলাম)

বছর	আসাম	দার্জিলিং	ডুয়ার্স	তরাই
	টা-আ-প	টা-আ-প	টা-আ-প	টা-আ-প
১৯৫১-৫২	১-১৩-৪	১-১-৮	১-৮-৪	১-৭-১
১৯৫২-৫৩	১-৯-৩	১-১৩-১	১-২-৭	১-২-৪
১৯৫৩-৫৪	২-০-৯	২-৬-৫	১-১৪-১	১-১৪-১১
১৯৫৪-৫৫	৩-৩-৪	৩-৮-৪	২-১৫-৮	৩-৩-৫

(২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত)

[টি-বোর্ডের টি-স্ট্যাটিসটিকস্—১৯৫৬]

১৯৫৩ সালে প্রতি একরে কাজের গড় পড়তা ব্যয়:

ডুয়ার্সের গড় পড়তা ২৩টি বাগানের ১,৩০৫·৬৯ টা.

তরাই-এর গড় পড়তা ৮টি বাগানের ১,১৮৩ ৭৫ টা.

দার্জিলিং পাহাড়ের গড় পড়তা ২০টি বাগানের ৭৫০·৮৫ টা.

[সূত্র :—ইনভেস্টরস্ ইয়ারবুক—১৯৫৫]

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তিনটি অঞ্চলেই একর পিছু খরচ ১৯৫১ সাল থেকে ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। দার্জিলিং-এর বাগানগুলির উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে এ হোল বাগিচা-মালিকদের বিশাল মুনাফার আর একটি উৎস।

একর পিছু গড় পড়তা খরচের হার

১৯৫১	৯২৫.২ টাকা
১৯৫২	৮৯১.৫ টাকা
১৯৫৩	৭৫০.৮৫ টাকা

দার্জিলিং পাহাড়ের ২০টি বাগানের মুনাফা

মোট আদায়ীকৃত মূলধন	৮৫,৪৮,০৫০ টাকা
মোট নীট মুনাফা (১৯৫১)	২,০৩ ২৪৫ ,,
মোট নীট মুনাফা (১৯৫৩)	১৯,৮২,৯৭১ ,,
মোট সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল	৪৪,২১,৬২৭ ,,

[সূত্র : ইনভেস্টরস ইয়ার বুক—১৯৫৫]

এই ২০টি বাগানের মধ্যে ৮টি বৃটিশ মালিকানাধীন বাগানই তখন পর্যন্ত তাদের ১৯৫৪ সালের হিসাব প্রকাশ করেছিল। এই আটটি বাগানের মুনাফার বহর থেকেই আভাস পাওয়া যাবে যে বাগিচা মালিকরা ১৯৫৪ সালে কি পরিমাণ মুনাফা করেছিল।

১৯৫৪ সালে ৮টি বৃটিশ মালিকাধীন
বাগানের মুনাফার চিত্র :—

মোট আদায়ীকৃত মূলধন—১৮,৬৩,৯০০ টাকা

মোট নীট মুনাফা

১৯৫৩	১৯৫৪
৫,৯০,০৪৬ টাকা	১৯,৯৪,৯৭৬ টাকা

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, চায়ের দাম বাড়ছিল, খরচ কমছিল এবং মুনাফা এমনকি ১৯৫৩ সালের তুলনায় চারগুণ বেড়েছিল। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার ডুয়ার্স ও তরাই-এর সমান মজুরী দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রমিকদের জন্য নির্ধারণের কথা চিন্তাও করতে পারে নি।

নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও গুলি চালিয়ে শ্রমিক হত্যা

পূর্বে দেওয়া নোটিশ অনুযায়ী দার্জিলিং পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হবার দুই দিন পূর্বে শহর ও বাগানের কমিউনিস্ট পার্টি ও গুর্খালীগ পরিচালিত চা-শ্রমিকদের দুটি ইউনিয়নের প্রায় সমস্ত নেতাদের গ্রেপ্তার করে দার্জিলিং জেলে রাখা হয়। একমাত্র কমিনিস্ট পার্টি পরিচালিত ইউনিয়নের সভাপতি রতনলাল ব্রাহ্মণ ও গুর্খালীগের নেতা প্রয়াত দেওপ্রকাশ রাই গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রতনলাল ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি বাড়ীর জানালা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে লাফিয়ে পড়ে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন।

যারা একই দিনে শহর থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দ পাঠক, সাংগদোপাল লেপচা, বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী দাওয়া লামা এবং এস. বি. রায়, প্রয়াত রাজেন সিনহা প্রমুখ প্রায় ২৫।৩০ জন কমিউনিস্ট ও গুর্খালীগ কর্মী ও নেতা। এদের সঙ্গে একই দিনে গ্রেপ্তার হন তদানীন্তন বি পি টি ইউ সি-র সহ-সম্পাদক-মনোরঞ্জন রায় (লেখক) এবং গুর্খালীগের কয়েকজন নেতাসহ আরো অনেকে।

এখানে উল্লেখ্য যে মনোরঞ্জন রায় ঐ বৎসরই মে দিবস উপলক্ষে সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আমন্ত্রিত একটি ট্রেড

ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই প্রথম ভারতবর্ষ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশন সোভিয়েতে যান। ঐ প্রতিনিধিদলে এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে ছিলেন ডাঃ রণেন সেন, টি এন সিদ্ধান্ত, মনোরঞ্জন রায় (পশ্চিমবঙ্গ); রামচন্দ্র মেনন (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী); পাটকার (মহারাষ্ট্র)। এছাড়া এইচ এম এস-এর আরো তিনজন নেতা এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। সোভিয়েত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দুইদিনের মধ্যেই মনোরঞ্জন রায় বি পি টি ইউ সি-এর পক্ষ থেকে ঐ ধর্মঘটকে সাহায্য করার জন্য দার্জিলিং যান এবং পরের দিনই গ্রেপ্তার হন।

এই ধর্মঘটকে ভাঙবার জন্য কংগ্রেস সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং দার্জিলিং জেলার এই পাহাড়ী অঞ্চলটিতে বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনী সমতলভূমি থেকে নিয়ে গিয়ে বাগানে বাগানে মোতায়েন করেন। সরকার প্রায়শঃই যে রকম ঘোষণা করতেন সেই 'আইন শৃঙ্খলা' রক্ষা করা এর উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। পুলিশ সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে শ্রমিক বস্তির ঘরে ঘরে রিভলবার আর বেয়নেট দিয়ে শ্রমিকদের শাসায় যে যদি এক্ষুণি কাজে যোগ না দেয় তবে ভয়ানক ফল ভুগতে হবে। কিন্তু এই পুলিশী সন্ত্রাস ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে ব্যর্থ হোল। ধর্মঘট চালু রইল। সরকার ও চা-মালিকরা পাগল হয়ে উঠল। আর তখনই শান্তিপূর্ণ চা-শ্রমিকদের উপর গুলি চালাবার নির্দেশ এলো। সরকারের তরফ থেকে ধর্মঘট ভাঙার সেটাই ছিল শেষ চেষ্টা।

২৫শে জুন মার্গারেট, মহারাণী গুণওয়ার আর রিংটন টি-এস্টেটের শ্রমিকরা মার্গারেট হোপ চা-বাগানের ভিতর দিয়ে মিছিল করে এগোচ্ছিল। শ্রমিকদের বলা হোল মিছিল ভেঙে

চলে যেতে। ১৪৪ ধারা জারী ছিল না বা মিছিলের উপর কোন নিষেধাজ্ঞাও ছিল না। কাজেই শ্রমিকরা পুলিশ অফিসারটির হুকুম মানতে রাজী হোল না। মিছিল চললো। যেসব প্রত্যক্ষ-দর্শী বেঁচে আছে তাদের বিবরণ অনুযায়ী, তখন কোন সতর্ক না করেই পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস আর সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালায়। ফলে দুজন নারী শ্রমিকসহ ছয়জন নিহত হয়। পুলিশের গুলিতে যারা নিহত হয়েছিলেন তারা হলেন—

	নাম	বয়স	বাগান
১।	কালে লিম্বু—	১৪ বছর	মার্গারেটহোপ
২।	হিতমান তামাং—	৫০ ,,	,,
৩।	কাঞ্চন সুন্দরাই—	২২ ,,	মহারাণীবাগান
৪।	নন্দলাল বিশ্বকর্মা—	২৩ ,,	,,
৫।	অমৃতমায়া কামিনি (মাইলী)—	১৭ ,,	মার্গারেটহোপ
৬।	মৌলীসেবা রাইনী—	২১ ,,	ছোট রিংটন বাগান

এছাড়া একটি শিশু বন্দিনী মায়ের কোলে জেলের ভিতরই মারা যায়।

একটি জাতীয় অভ্যুত্থান

পাহাড়ী অঞ্চলটির সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই গুলি চালনা ও হত্যা তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে। শহরে খবর পৌঁছবার সংগে সংগেই সাধারণ মানুষ পথে নেমে আসেন। তাঁরা সারা রাত ধরে মর্গের ওপর সতর্ক প্রহরা রাখেন যাতে শহীদদের মৃতদেহ পুলিশ সরিয়ে না নিয়ে যেতে পারে। পরদিন সকালে দার্জিলিং শহর আর মার্গারেট হোপ চা-বাগান সমেত কয়েকটি চা-বাগানে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়, কিন্তু তখন আর মানুষ ১৪৪ ধারা মানার মত মানসিকতায় ছিল না। দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষের গম্ভীর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখ দেখে স্থানীয় সরকারী অফিসাররা ভীত হয়ে

উঠলো। পরদিন সকাল থেকে শহরের সমস্ত দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য সব স্বতস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে গেল; বাস-ট্রাক সহ সমস্ত রকম যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। ১৪৪ ধারা কেবল কাগজে কলমেই রইল। গুলি চালনার জন্য দোষী অফিসারদের অবিলম্বে সাসপেনশন, আহত-নিহতদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ আর গুলি চালনার বে-সরকারী তদন্ত দাবি করে মানুষ সারাদিন শহরে মিছিল করলো আর শ্লোগানে শ্লোগানে শহর উচ্চকিত করে তুললো।

এই নৃশংস গণহত্যার খবর শুনে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে হাজার হাজার চা-শ্রমিক বাগান ছেড়ে শহরের দিকে আসতে লাগলো। মানুষের আবেগ তখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছল, পুরো শহর যেন টগবগ করে ফুটছিল, সরকারী কলে:জর ছাত্ররা, মিশনারী স্কুল কলেজের ছাত্রদের নিযে স্কুল কলেজ ছেড়ে বের হযে এলো। তাদের সঙ্গে তাদের শিক্ষকরাও যোগ দিলেন। পরদিন, কাজের দিন হওযা সত্ত্বেও, আদালত বন্ধ রইল। ইতি-মধ্যে শহরের প্রভাবশালী নাগরিকরা দ্রুত সবরকম মতের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী এক নাগরিক কমিটি গড়ে ফেললেন। উপ-কৃষিমন্ত্রী ও দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার শান্তি বজায রাখতে তাদের কাছে আবেদন জানালেন। বাগানগুলি থেকে শ্রমিকরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের মানুষের দৃঢ়তা বেড়ে গেল এবং নিহতদের দেহ ফেরত দেবার জন্য জনগণের ক্রমাগত দাবির মুখে ডেপুটি কমিশনার সভা করার জন্য নাগরিক কমিটিকে বিশেষ অনুমতি দিলেন।

পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনার ক্ষমতা নাগরিক কমিটির ছিলনা। সুতরাং জনসভা হবার পর তাঁরা ডেপুটি কমিশনারকে খোলাখুলি বললেন যে, যদি কমিউনিষ্ট নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ ও সারাভারত গুর্খালীগের সাধারণ সম্পাদক দেওপ্রকাশ রাইযের (এঁরা যথাক্রমে

মজদুর ইউনিয়ন ও শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদক) উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া না হয় তবে তাদের পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। ডেপুটি কমিশনারকে তাদের উপদেশ মানতে হোল এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তখনই তুলে নেওয়া হলো। ২৭শে জুন দার্জিলিংয়ে হরতাল চললো এবং কাশিয়াং-এও বিস্তার লাভ করলো। রতনলাল ও দেওপ্রকাশ দুই নেতা নিহতদের দেহগুলি দাবি করলেন। ডেপুটি কমিশনার তখনই দেহগুলি ফেরত দিলেন। তারপর প্রায় পনের হাজার মানুষ শবানুগমন করলেন।

ভ্রাতৃত্বমূলক আন্দোলন হিসাবে তরাইয়ের এগারোটি বাগানের শ্রমিকরা গুলি চালনার প্রতিবাদে ও দার্জিলিং-এর শ্রমিক ভাইদের সমর্থনে একদিনের ধর্মঘট করলেন। ২৮শে জুন সরকার মুক্ত নেতাদের ও নাগরিক কমিটির এক যৌথ সভা ডাকলেন সমস্ত বিষয়গুলির দ্রুত মীমাংসার জন্য। সেখানে সরকার রাজী হলো—তখনকার মজুরী একটাকা চার আনার স্থানে একটাকা সাত আনা অবিলম্বে যাতে দেওয়া হয় তা দেখা হবে, স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের বিষয়টি বিবেচনা ও আলাপ-আলোচনার পর ট্রাইবুনালে পাঠানো হবে, বোনাসের দাবিটি ট্রাইবুনালে পাঠানো হবে, কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, আটক সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে। কেবল কয়েকটি কেস ডেপুটি কমিশনার পর্যালোচনা করে তবে মুক্তি দেবেন।

নেতারা এইসব সর্তে রাজী হলে ২৯শে জুন থেকে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হোল। কিন্তু ধর্মঘট তুলে নেবার অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থলেই উভয় তরফে লিখিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়নি এই অজুহাতে সরকার একের পর এক তার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি ভঙ্গ করতে শুরু করে।

এর পরেও বহুদিন পর্যন্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়নি।

শ্রমিক রমণী শ্রীমতী গুপ্তি মায়া রাইনি ২ বৎসরের শিশু কন্যাসহ গ্রেপ্তার হন। বন্দী থাকাকালীন অবস্থায় কার্শিয়াং সাব জেলে ঐ শিশু কন্যাটি অসুস্থ অবস্থায় বিনা ওষুধে, বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এই ঘটনাটিকে ধরলে আন্দোলনে নিহত বা মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় সাত।

এরপরও সংগ্রাম চলতে থাকে। তারপরও বহুদিন পর্যন্ত বেতনবৃদ্ধি ঘটেনা। অনেক টানাটানির পর সরকার পুরুষ-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ১-৬-০ টাকা স্থির করতে ও ন্যূনতম বেতন আইন অনুযায়ী বাকী বিষয়গুলির জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে রাজী হন।

ধর্মঘট উঠে যাবার পর সরকার নিজেদের প্রতিশ্রুতিগুলি ভাঙ্গতে শুরু করেছিল। বিভেদকামী শক্তিগুলি বিভিন্ন বাগানে সক্রিয় হয়ে উঠলো যাতে দু'টি ইউনিয়নের ঐক্য ভাঙ্গা যায় আর দু'টি ইউনিয়নের নেতৃত্বকে বেইজ্জত করা যায়। কিন্তু মানুষ তিক্ত সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তারা মনোবল হারাতে বা ঐক্য ভাঙ্গতে দিতে রাজী ছিল না। এমন কি যে বাগানে গুলি চলেছিল সেই বাগানের শ্রমিকদের মনোবল শক্ত ছিল। সরকার বা মালিকপক্ষ আবার ভয়ভীতি ছড়াতে বা মনোবল ভাঙ্গতে বা শ্রমিক ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাতে ব্যর্থ হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও শিক্ষা

দেশের ঐ অংশে ঐ ধরণের সংগ্রাম ছিল সেই প্রথম। অতীতে কখনও সেখানে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট বা দার্জিলিং-এ হরতাল হয়নি। সংগ্রাম শুরু হয়েছিল শ্রমিকদের ঐক্যের ভিত্তিতে যা তাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

তাই দার্জিলিং-এর শ্রমিকশ্রেণী বিভেদকামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের ঐক্য আরো শক্তিশালী করতে মালিকপক্ষ ও সরকারকে তাদের বাকী দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংগ্রাম দার্জিলিং পাহাড়ের সমগ্র জনগণের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ আরেকবার কংগ্রেস সরকারের প্রকৃত চরিত্র ও তার আভ্যন্তরীণ নীতির প্রকৃত অর্থ কি তা দেখতে পেল।

০-৩-৬ টাকা মজুরী বৃদ্ধি (ধর্মঘটের নোটিশ দেবার পর ০-১-৬ টাকা এবং পরে আরো দু'আনা) মানে প্রতিমাসে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আরো দার্জিলিং-এর জনগণের হাতে এলো। না হলে এই টাকার একটা বড় অংশ ভারতবর্ষের বাইরে বৃটিশ পুঁজির মুনাফা হিসাবে চলে যেতো।

সেই প্রথমবার স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের বিষয়টি শিল্প বিরোধ বলে গণ্য হোল। সরকার শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সের শ্রমিকদের একই বেতনের বিষয়টি একটি তদন্ত কমিটিতে দিতে বাধ্য হোল (গত দু'বছর ধরে বেতন উপদেষ্টা কমিটির সর্বসম্মত প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও সরকার বিষয়টি তদন্ত কমিটিতে পাঠাতে বারবার অস্বীকার করেছিল)।

দার্জিলিং-এর শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চা-বাগান এলাকা সেদিন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। ডুয়ার্সের চা-শ্রমিক দার্জিলিং-এর শ্রমিকদের কাছ থেকে আর একবার শিখলো যে, শ্রমিকশ্রেণীর সামনে ঐক্যই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তাই দু'মাস পরে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের দু'লক্ষাধিক শ্রমিক, বোনাস ও অন্যান্য দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট করেছিলেন। দার্জিলিং-এর বীর শ্রমিকরা পথ দেখিয়েছিলেন—শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার সঠিক পথ, যা সংগ্রামের মাধ্যমে দৃঢ় হয়েছিল, দুর্দিনেও অটুট ছিল।

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে জ্যোতি বসু ও মনোরঞ্জন রায় দার্জিলিং মার্গারেট হোপ টি এস্টেট, যেখানে জুন মাসে পুলিশ গুলি চালিয়ে ছয়জন শ্রমিককে হত্যা করেছিল, সেই স্থান পরিদর্শন করতে যান। সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিং জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক এবং চিয়াকামান মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি রতনলাল ব্রাহ্মণ, আনন্দ পাঠক, ইউনিয়নের তদানীন্তন সম্পাদক ভদ্রবাহাদুর হামাল, শিলিগুড়ির বীরেন বোস ও কানু সান্যাল। বাগানে পৌঁছবার পর বাগানের শ্রমিকরা পাহাড়ের যেইস্থানে গুলি চালিয়েছিল সেই স্থানটি এঁদের দেখাবার জন্য নিয়ে যান। এই শ্রমিকরা গুলি চালনার দিন সবাই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা শ্রমিক ছিলেন তাঁরা বললেন—যে দুজন নারী শ্রমিক সেদিন গুলিতে নিহত হয়েছিল তারা একই লাইনে পাশে পাশে যাচ্ছিল। বিনা প্ররোচনায় বা হুঁশিয়ারী না দিয়েই অকস্মাৎ পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে, ফলে সেইখানেই ছয়জন নিহত হন। শ্রমিকরা রাস্তার ধারে গাছের উপরে গুলির দাগ দেখালেন, এত বৃষ্টিতে রক্তের দাগ মুছে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পাহাড়ে ও আশে পাশের গাছে গুলির দাগ তখনও মুছে যায় নি। বাগান থেকে ফিরে গিয়ে পরদিন দার্জিলিং বাজারে এক বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং ভাষণ দেন জ্যোতি বসু, মনোরঞ্জন রায় ও ভদ্রবাহাদুর হামাল। আগেই বলা হয়েছে, গুলি চালনার পরে পরেই জুন মাসের ২৮ তারিখে সরকার রতনলাল ব্রাহ্মণ, গুর্খালীগের নেতা দেওপ্রকাশ রায়, ভদ্রবাহাদুর হামাল প্রভৃতির উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেয়। ঐ সময় সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার রাজ্য সভার সভ্য ছিলেন। দার্জিলিং-এ গুলি চালনার ঘটনার পর তিনিও দিল্লী থেকে দার্জিলিং-এ এসে উপস্থিত হন। তদানীন্তন কংগ্রেসের শ্রম বিভাগের উপমন্ত্রী, দুটি ইউনিয়নের যুক্ত কমিটি এবং নাগরিক

কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসেন এবং শ্রমিকদের কতগুলি অলিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন।

দার্জিলিংয়ে বিশাল জনসভায় জ্যোতি বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সরকারকে এই বলে হুঁশিয়ারী দেন যে সরকার বেতন বৃদ্ধি সহ অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগুলি অবিলম্বে কার্যকরী না করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরকারকেই বহন করতে হবে। উল্লেখ্য, সেই সময় ডুয়ার্স ও তরাইয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছিল এবং সেখানে ধর্মঘট শুরু হবার মুখেই সরকার শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং-এর বেতন বৃদ্ধির দাবিটি মেনে নেন।

জুন মাসে দার্জিলিং চা শ্রমিকদের মীমাসার শর্ত হিসাবে সরকারের পক্ষ থেকে বেতন বৃদ্ধি করা হবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পরে কলকাতায় নিম্নতম মজুরী উপদেষ্টা কমিটির সভায় ও ত্রিদলীয় বৈঠকে মালিকদের বিরোধীতায় বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন মীমাংসা হয় নি, শ্রমিক প্রতিনিধিরা অবিলম্বে মজুরী বৃদ্ধির জন্য দাবি উত্থাপিত করেন। সরকার পক্ষ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার সময় উপ-শ্রমমন্ত্রী ১ টাকা ৬ আনা মজুরী নির্ধারণ করা হবে বলে পুনরায় প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু দুই মাস অতীত হলেও সরকার চুপ করে থাকার নীতি গ্রহণ করেন। পরে নেতৃবৃন্দের হুঁশিয়ারী পাবার পর নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি জারী করেন।

"দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল সমূহের ১৯৪৮ সালের মজুরী আইন অনুযায়ী গঠিত চা বাগান উপদেষ্টা কমিটি এবং মজুরীর নির্ধারিত নিম্নতম হার পর্যালোচনা ও প্রয়োজন হইলে তাহা সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত নিম্নতম মজুরী উপদেষ্টা পর্ষদের সহিত পরামর্শ পূর্বক পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল সমূহের চা-বাগান শ্রমিকদের নির্ধারিত নিম্নতম মজুরীর হার সংশোধন করিয়াছেন। সংশোধিত মজুরীর হার

নিম্নরূপ এবং উহা ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্যকরী হইবে :

(১) স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ বয়স্ক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে স্বেচ্ছায় বর্ধিত ৬ পয়সা সমেত প্রত্যেক শ্রমিকের ক্ষেত্রে দৈনিক মজুরী ১৪ পয়সা করিয়া বাড়ানো হইল। ফলে বাগানের পুরুষ শ্রমিকরা দৈনিক মোট ১ টাকা সাত আনা ও নারী শ্রমিকরা দৈনিক নগদ মোট ১ টাকা ৬ আনা করিয়া মজুরী পাইবেন।

(২) শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সাসের ১লা এপ্রিল হইতে স্বেচ্ছায় বর্ধিত ৩ পয়সা সমেত প্রত্যেক শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ৭ পয়সা করিয়া বাড়ান হইল। ফলে বাগানের শিশু শ্রমিকরা দৈনিক নগদ বার আনা করিয়া এবং কারখানার শিশু শ্রমিকরা দৈনিক মোট ১৩ আনা করিয়া মজুরী পাইবেন।

(৩) যে সব কর্মচারী বেতন পান তাহাদের বেতনও যাহাতে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে "

ডুয়ার্স তরাই-এর চা-বাগানে ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘট

দার্জিলিং পাহাড়ের চা-বাগান শ্রমিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৫৫ সালের ২৯শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গে হিমালযের পাদ-দেশের সমগ্র চা এলাকা স্তব্ধ হয়ে যায়। বিহার সীমান্ত থেকে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় দুশো মাইল জুড়ে ১৩৭টি বাগানের দু-লক্ষ চা শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘট করলেন। সমস্ত রকম রাজ-নৈতিক মতাবলম্বী এবং দেশের চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত সাতটি বিভিন্ন ইউনিয়নের ডাকে এই ধর্মঘট হয়। চা-বাগিচা শ্রমিকদের ইতিহাসে এই প্রথম সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংগঠিত ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের, যাদের অক্টোপাশ সুলভ

কব্জায় চা-শিল্প ও ব্যবসা কুক্ষিগত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালিত করা গিয়েছিল। পুঁজি নিয়োগকারী, এজেন্ট, টি টেষ্টার, নীলামদার, বাগানের সাপ্লায়ার, এমনকি শ্রমিকদের চাল সরবরাহকারী পর্যন্ত, কলকাতার গুদাম মালিকরা, পরিবেশ-করা সকলেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এমন কি ভারতের চায়ের রপ্তানী বাণিজ্যও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতো লণ্ডন নীলাম বাজারের উপর। এই কারণেই তারা ভারত সরকারকে শর্ত-আরোপ করতে পারত; সরকারও অবশ্য তাদের কথায় চলতে প্রস্তুত ছিল।

পশ্চাৎপট

প্রায় অর্ধ শতাব্দী জুড়ে চা-শ্রমিকরা অর্ধ ক্রীতদাসের জীবন-যাপন করে এসেছে। দেশজোড়া শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব তাদের উপরেও পড়ে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে চা-শ্রমিকরা সংগঠিত হতে শুরু করে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য শিল্প শ্রমিকদের মতই, চা সম্রাটদের অমানুষিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের অসংগঠিত অবস্থা এবং অনৈক্যই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে, কয়েকটি বাগানে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট হয়েছে, কিন্তু কখনোই ব্রিটিশ মালিকদের বিরুদ্ধে এরকম ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়নি।

ডুয়ার্স ও তরাই-এর যে সাতটি ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল তারা হোল :—জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (এ আই টি ইউ সি), পশ্চিমবঙ্গ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন (আই এন টি ইউ সি ও পি এস পি'র নেতৃত্বাধীন), দুটি কর্মচারী ইউনিয়ন (একটি আই এন টি ইউ সি ও অপরটি এইচ এম এস'র সঙ্গে যুক্ত) দার্জিলিং জেলা চিয়াকামান মজদুর ইউনিয়নের তরাই শাখা

(এ আই টি ইউ সি) ও তরাই-এর স্থানীয় কংগ্রেসের পরিচালিত আরেকটি আই এন টি ইউ সি ইউনিয়ন। সুতরাং ডুয়ার্সের কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়নটি ছাড়া সমস্ত রকমের ইউনিয়ন যুক্তভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল।

যুক্ত দাবিগুলি ছিল :—(ক) ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের জন্য চার মাসের বোনাস; (খ) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার-এর সংশোধন; (গ) ১৯৫২ সালের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন চাবাগানে সম্প্রসারিত করা; (ঙ) বিভিন্ন বাগানের ছাঁটাই কর্মচারীদের ফিরিয়ে নেওয়া।

বিগত দু'বছর ধরে শ্রমিকরা উপরোক্ত দাবিগুলিতে প্রচার চালাচ্ছিলেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ চা-সম্রাটরা তাদের অধঃস্তন সঙ্গী ভারতীয় চা-করদের সহযোগিতায় এ বিষয়গুলিতে চুপ করে ছিল আর বিভিন্ন বাগানে ছাঁটাই চালিয়ে যাচ্ছিল। সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার। যখন সবকয়টি ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটিশ দিল, সরকার আলাপ আলোচনার জন্য এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল ১৬ই আগষ্ট অর্থাৎ যেদিন ধর্মঘট শুরু হবার কথা। এই মিটিং-এ চা-মালিকরা শ্রমিকদের সবকয়টি দাবিতেই শুধুমাত্র "না" বলে দিলেন। সরকার চুপ করে রইল। চা-মালিকরা ও সরকার বিষয়গুলিকে বাগিচা শ্রমিকদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির কাছে পাঠান। কিন্তু বাগিচা মালিকরা একগুঁয়ে মনোভাব ছাড়ল না। উপরোক্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিং-এ বাগিচা মালিকরা বা সরকার কেউই আশ্বাস দিলেন না যে তাঁরা দাবিগুলি, বিশেষতঃ বোনাস সম্পর্কে বিবেচনা করতে রাজি আছেন। কাজেই শ্রমিকদের কাছে তাদের আগেকার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না। ফলে ২৯শে আগষ্ট ধর্মঘট শুরু হোল। ডুয়ার্সের আর এস পি পরিচালিত একটি ইউনিয়ন অবশ্য ১৬ই আগস্ট থেকেই ধর্মঘট

শুরু করেছিল। এভাবেই ডুয়ার্স ও তরাই-এর চা-শ্রমিকদের বৃহত্তম ধর্মঘট শুরু হোল সর্বাধিক শক্তিশালী মালিকদের বিরুদ্ধে।

চা-সম্রাটদের মুনাফা

পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই-এর চা বাগিচা মালিকরা ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে এত বিপুল পরিমাণ মুনাফা করেছিল যে এমন কি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীকেও বিধানসভায় স্বীকার করতে হয়েছিল যে, "চা-বাগিচাগুলি ১৯৫৪ সালে বিপুল লাভ করেছে।" কয়েকটি উদাহরণ দেখালে বোঝা যাবে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে কি পরিমাণ মুনাফা তারা করেছিল।

১৯৫৪ সালে ডুয়ার্সের তেইশটি ব্রিটিশ মালিকানার বাগান, যার মোট পুঁজিই ছিল ১,৮২,৫৭,৮০০ টাকা, লাভ করেছিল ১,৪৬,০৬,৩৭৭ টাকা। তরাই-এর নয়টি বাগান, যার মোট পুঁজি ছিল ৬৩,৭৫,০০০ টাকা, লাভ করেছিল ঐ একই বছরে ৩৪,২০,০২৮ টাকা। ভারতীয় মালিকরাও ব্রিটিশ একচেটিয়াপতিদের থেকে পিছিয়ে ছিল না। কয়েকটি উদাহরণ থেকেই দেখা যাবে যে ডুয়ার্সের বাগানগুলি থেকে ভারতীয় মালিকরা কি বিপুল পরিমাণ মুনাফা করেছিল।

(১) কাটালগুড়ি টি এস্টেট

মূল মূলধন	৭৫,০০০ টাকা
শেয়ারের মূল্য	৭,১২,৫০০ টাকা
মোট মূলধন	৭,৮৭,৫০০ টাকা
নীট লাভ (১৯৫৩)	৮,৬৪,৭৬৮ টাকা
ম্যানেজিং এজেন্ট ও ডাইরেক্টরের কমিশন	৪৩,২৩৮ টাকা
মোট লাভ	৯,০৮,০০৬ টাকা

(২) জলপাইগুড়ি টি কোম্পানী (মোগলকাটা টি এস্টেট)

মূল মূলধন ৫০,০০০ টাকা
শেয়ারের মূল্য ৬,৫০,০০০ টাকা
মোট পুঁজি ৭,০০,০০০ টাকা
নীট লাভ (১৯৫৩) ৮,১৯,৩৮৩ টাকা
ম্যানেজিং এজেন্ট ও ডিরেক্টরের কমিশন ৫,৬৭৭ টাকা
মোট লাভ ৮,২১,০৬০ টাকা

(৩) ডায়ানা টি এস্টেট

মূল মূলধন ১,২৪,২০০ টাকা
শেয়ারের মূল্য ৩,৭২,৬০০ টাকা
মোট মূলধন ৪,৯৬,৮০০ টাকা
নীট লাভ (১৯৫৩) ৬,৩৬,১৮৮ টাকা
ডিরেক্টরের কমিশন ১২,৭১৩ টাকা
মোট লাভ ৬,৪৮,৯১১ টাকা

(৪) গোপালপুর টি এস্টেট

মূল মূলধন ১,৫ ,০০০ টাকা
শেয়ারের মূল্য ৯,০০,০০০ টাকা
মোট মূলধন ১০,৫০,০০০ টাকা
নীট লাভ (১৯৫৩) ৭,১২,৬৮৬ টাকা
ম্যানেজিং এজেন্ট ও ডিরেক্টরের কমিশন ৯২,৩৯৫ টাকা
মোট মুনাফা ৮,০৫,০৪১ টাকা

(৫) আটিয়াবাড়ী টি এস্টেট

মূল মূলধন ৫৫,০০০ টাকা

শেয়ারের মূলধন	৪,৫০,০০০ টাকা
নীট লাভ (১৯৫৩)	১০,০৭,২০৪ টাকা
ডাইরেক্টরের কমিশন	২০,১৪৪ টাকা
মোট লাভ	১০,২৭,৩৪৪ টাকা

উপরোক্ত কয়টি উদাহরণ হোল ১৯৫৩ সালের মুনাফার নমুনা। সব কোম্পানীর ১৯৫৪ সালের ব্যালান্সশীট তখনও প্রকাশিত হয় নি। যে কয়টি প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৪ সালের মুনাফার ধারা ১৯৫৩ সালের দ্বি-গুণ বা তিন গুণ হয়েছে।

ডুয়ার্স (সমস্ত ব্রিটিশ বাগিচা)

বাগান	ম্যানেজিং এজেন্ট	ডিভিডেণ্ড ১৯৫৩	ডিভিডেণ্ড ১৯৫৪
সরুগাঁও টি এস্টেট	(এ্যাণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানী)	১২½%	৪৫½%
জয়বীর পাড়া টি এস্টেট	(ঐ)	২৫%	৬৫%
ওদলা বাড়ী	(অক্টোভিয়াস স্টীল এণ্ড কোং)	২০%	৬৫%
গয়ের কাটা	(গিলাণ্ডার্স আরবুথনট এণ্ড কোং)	২০%	৭০%
চুনাভাটি	(এ্যাণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং)	২৫%	৯০%
ইঙ্গো টি এস্টেট	(ঐ)	৫%	১১০%
নিউ ডুয়ার্স টি এস্টেট	(ঐ)	৪৫%	১১০%
বানারহাট টি এস্টেট	(ঐ)	৪৫%	১২০%

১৯৫৩ সাল যে ইঙ্গো টি এস্টেট মাত্র ৫% ডিভিডেণ্ড দিয়েছিল, ১৯৫৪ সালে সেই কোম্পানীই দিচ্ছে ১১০%। এটা হোল তাদের ১৯৫৪ সালের মুনাফার আভাস।

ডুয়ার্সের বাগিচার মতই তরাই ও দার্জিলিং-এর বাগানগুলিরও মুনাফা ১৯৫৪ সালে একই রকম বেড়েছে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস

সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে বাগিচা মালিকরা কোন বোনাস দিতে পারতো কি না। কারণ ১৯৫৩ সাল থেকে ফেলে রাখা প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট চালু করলে নাকি তাদের অনেক টাকা খরচ করতে হোত।

ঐক্য কি করে গড়ে উঠল

ডুয়ার্স ও তরাই-এর দু'লাখ শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের পথ জটিল ও আঁকাবাঁকা, বিশেষ করে যেখানে বিভিন্ন দলমতের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের অবস্থান আছে। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ডুয়ার্স অথবা দার্জিলিং-এ যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কোন প্রচেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে হয় নি। বিভিন্ন ইউনিয়ন তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের অনুগত শ্রমিকদের দ্বারা আন্দোলন চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে পি এস পি পরিচালিত ইউনিয়নের নেতৃত্বে তিন দিনের ধর্মঘট পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাদের নিম্নতম দাবি-দাওয়ার কোন মীমাংসা হয় নি। বিভিন্ন ইউনিয়নে তাই দাবি-দাওয়া প্রস্তুত করা নিয়ে এতদিন পর্যন্ত কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয় নি। ইউনিয়নগুলির মধ্যে পরস্পর বৈরীভাব ছিল বলে একসঙ্গে বসাও সম্ভবপর ছিল না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাগানে পি এস পি ইউনিয়নের শ্রমিকদের সঙ্গে এ আই টি ইউ সি ইউনিয়নের শ্রমিকদের সংঘর্ষ হোত। ১৯৫৩ সালে এ আই টি ইউ সি-র ইউনিয়ন যখন এই ঐক্য সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে ঠিক সেই সময়ই নাগরাকাটা থানায় অবস্থিত হিলা চা বাগানে এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে যুক্ত জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ একটি সভা করতে যান তখন ঐ বাগানের পি এস পি নেতা ও শ্রমিকরা তাদের আক্রমণ করে। ফলে জিলা

চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্যতম নেতা অসিত সেন গুরুতর আহত হয়ে কোনরকমে বাগান থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় সেখান থেকে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে পাঠান হয়। হাসপাতালে দীর্ঘদীন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই ঘটনায় জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ভিতরে ঐক্যের ব্যাপারে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তাও কিছু দিনের জন্য ব্যাহত হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বি পি টি ইউ সি-র নেতৃত্ব ঐক্যের প্রশ্নটি স্থগিত রাখতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বি পি টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে চা-বাগান আন্দোলনের মূল দায়িত্বে ছিলেন বি পি টি ইউ সি-এর সহঃ সম্পাদক মনোরঞ্জন রায়। বি পি টি ইউ সি-র জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তখন দাবি ছিল ন্যূনতম দৈনিক মজুরী দুই টাকা। এবং ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত শ্রমিকরা যে পাঁচ টাকা মণ দরে রেশন পেত, যা পরবর্তী কালে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই বাড়তি দাম প্রত্যাহার করে পাঁচ টাকা মণ দরেই রেশন সরবরাহ করতে হবে।

একই সময়ে পি এস পি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি ছিল দৈনিক ন্যূনতম মজুরী এক টাকা বার আনা করতে হবে অর্থাৎ জিলা চা-বাগান ইউনিয়নের থেকে চার আনা কম ছিল তাদের দাবি।

এইখানে একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হন বি পি টি ইউ সি-র নেতৃত্ব। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দুই টাকা দৈনিক মজুরী এবং পাঁচ টাকা মণ দরে চাল, এই দাবির কোন মীমাংসা হওয়া দূরের কথা পশ্চিমবঙ্গ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি এক টাকা বার আনাও মালিকরা দিতে প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবে আন্দোলন করে কোন দাবিই-তো আদায় করা সম্ভব নয় এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। এইখানেই জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সামনে প্রশ্ন আসে যে তারা তাদের দাবি দুই টাকা

থেকে কমিয়ে এনে এক টাকা বার আনা রাখবেন কি না এবং পাঁচ টাকা মণ দরে চাল সরবরাহ করার দাবি স্থগিত রেখে দুই ইউনিয়নের একই দাবি তুলে ধরে যৌথ আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালাবেন কি না। প্রশ্নটা আজকের দিনে খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু তখনকার দিনে দুই পরস্পর বৈরী মনোভাবাপন্ন ইউনিয়নের মধ্যে এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা খুব কঠিন ছিল। বিশেষ করে জিলা চা-বাগান ইউনিয়নের নেতৃত্ব যখন জেলে ছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করে ট্রেড ইউনিয়নকেও প্রকৃত পক্ষে বে-আইনি করা হয়, তাদের পক্ষে যখন প্রকাশ্যে কোন কাজ করা অসম্ভব ছিল সেই সময় মালিকদের সহায়তায় পি এস পি পরিচালিত আই এন টি ইউ সি ইউনিয়ন গঠিত হয়। একথা শ্রমিকদের অজানা ছিল না। ইউনিয়নের অপেক্ষাকৃত কম মজুরীর দাবি এবং বর্ধিত হারে রেশন সরবরাহকে স্বীকার করে নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা বি পি টি ইউ সি ইউনিয়নের শ্রমিকদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেকথা জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বের অজানা ছিল। শ্রমিকদের মনোভাব যাচাই করে দেখার জন্য ইউনিয়নের একটি কার্যকরী সমিতির বর্ধিত সভা ডাকা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুবোধ সেন। ইউনিয়নের সভাপতি তখন ছিলেন সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার। তিনি তখন রাজ্যসভার সভ্য ছিলেন। তিনি এসব ব্যাপারে বড় বেশী অংশ নিতেন না, খুব কম কার্যকরী সভাতেই তিনি উপস্থিত থাকতেন। সেই সভাতেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক দেবপ্রসাদ ঘোষ, ইউনিয়নের নেতা গোবিন্দ কুণ্ডু, অসিত সেন প্রমুখ এবং বি পি টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন রায়।

ঐ সভায় যে সব বাগান থেকে শ্রমিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে প্রধান ছিলেন ভগতপুর চা-বাগানের 'মংলু ভগত,

পুনাই ওঁরাও এবং অন্যান্য শ্রমিকরা; সোনগাছি বাগানের ছিলেন ঝুকু সাওয়ার, মহেন্দ্র সিং, কুরপুনা সর্দার প্রমুখ; তাছাড়া আহাই-পাতা বাগানের নেতাদের মধ্যে ছিলেন জগন্নাথ ওঁরাও, ফাগু ওঁরাও, টেম্বু ওঁরাও, সিমন ওঁরাও এবং বাগানের অন্যান্য তদানীন্তন শ্রমিক নেতারা; বানারহাটের কাঠালবাড়ী চা-বাগানের নেতা সীতারাম ওঁরাও এবং অন্যান্যরা; রেড ব্যাঙ্ক বাগানের বলদেও ওঁরাও; ডায়না বাগানের নমুনা ওঁরাও; এছাড়া কুর্তি, হিলা, নাগরাকাটা প্রভৃতি বাগানের শ্রমিকরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্যে যে একটা স্থিতাবস্থা চলছিল সেটা কাটিয়ে উঠে দুর্বার গতিতে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কি না সেটাই ছিল প্রশ্ন। সভার শুরুতে মনোরঞ্জন রায় তদানীন্তন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা ক'রে এবং দার্জিলিং-এর চা শ্রমিকদের ঐক্য ও সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে চা-শ্রমিকদের উপর দেশী বিদেশী মালিকদের অত্যাচার ও নিপীড়নের চিত্রটি তুলে ধরেন। ১৯৫২ সালে তথা-কথিত চা শিল্পে সংকটের অজুহাত তুলে যেভাবে শ্রমিকদের উপর ব্যাপকভাবে বেতন কাটা ও ছাঁটাই করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করা সম্ভব হয় নি। এর মূল কারণ ছিল শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য। কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি ইউ সি এবং পি এস পি পরিচালিত আই এন টি ইউ সি উভয়েই মালিকদের সমর্থন এবং সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল, যখন এ আই টি ইউ সি ইউনিয়ন কার্যত: বে-আইনি ছিল। কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের নেতৃত্বের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম বিমুখতা ছিল। পি এস পি পরিচালিত ইউনিয়ন অবশ্য ১৯৫৩ সালে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এককভাবে তিন দিনের ধর্মঘট করেছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সমস্ত কথা বিচার বিবেচনা করে তিনি

শ্রমিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন এবং সেই ঐক্য গড়ার জন্য দুই ইউনিয়নের একই দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তাব রাখেন। অর্থাৎ এ আই টি ইউ সি-র দাবিকে নামিয়ে পি এস পি ইউনিয়নের দাবিকে সমর্থন করার প্রস্তাব রাখেন মনোরঞ্জন রায়।

শ্রমিক নেতাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রথমে বলতে ওঠেন ভগতপুর বাগানের তদানীন্তন শ্রমিক নেতা মংক ভগত। তিনি সমস্ত যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে মনোরঞ্জন রায় উত্থিত প্রস্তাবকে সমর্থন করে তার বক্তব্য জোরালো ভাষায় পেশ করেন। তিনি বলেন, "পি এস পি ইউনিয়নের তুলনায় আমাদের দাবি উচ্চতর হলেও তার কোন মূল্য নেই। যেমন মূল্য নেই পি এস পি ইউনিয়নের আলাদাভাবে কম দাবি পেশ করার। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে ১৯৫৩ সালের তিন দিনের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। ঐ ধর্মঘট আমরা সমর্থন করি নি, পি এস পি ধর্মঘট করলো। মালিকরা তো এক পয়সাও মজুরী বাড়ালো না। তাছাড়া এককভাবে ধর্মঘট করে মালিকদের দাবি মানাতে বাধ্য করানোর শক্তি আমাদের নেই। সেই অবস্থায় আমাদের মধ্যে এই বিভেদ এবং দাবির পার্থক্যের সুযোগ নিচ্ছে মালিকরা, শ্রমিকদের তো তাতে কোন লাভ হচ্ছে না"

তারপর একের পর এক শ্রমিক প্রতিনিধি উঠে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে লাগলো। এইসব শ্রমিকদের বক্তব্য সহজ সরল ভাষায় ছিল—"এতদিন আমাদের দাবি নিয়ে আমরা প্রচার করেছি। আমরা যে বর্ধিত দাবি রেখেছিলাম সে দাবিতো পেলাম না। পি এস পি উত্থিত দাবিরও কোন মীমাংসা হোল না। তাতে মালিকই লাভবান হয়েছে। যদি আমরা একই দাবি নিয়ে যৌথ আন্দোলন শুরু করতে পারি তবে মালিকের পকেট থেকে কিছু টাকা ছিনিয়ে আনতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস আছে।"

এই সভার এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল সেদিন অভাবনীয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বিবৃতি ও ইস্তাহার দিয়ে পি এস পি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ চা-শ্রমিক ইউনিয়নকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আবেদন জানায়। জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ১ টাকা ১২ আনা দৈনিক মজুরী, বাড়তি পাতা তোলার বাড়তি মজুরী, বোনাস, বাগিচা শ্রম আইন কার্যকরী করা ও স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধনের দাবিতে প্রচার শুরু করল। দাবিগুলো হয়ে উঠল সাধারণ শ্রমিকদের দাবি। এইভাবেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথ তৈরী হোল। উভয় ইউনিয়নের একই দাবি প্রচারের ফলে সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চলে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হোল। শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আস্থা ফিরে এলো। এককথায় সমগ্র ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হোল।

১৯৫৪ সালে পাতা তোলার মরশুমে উপরোক্ত দাবিগুলি উত্থাপিত করে জিলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন উভয়েই ধর্মঘটের নোটিশ দিল। পাতা তোলার মরশুমটা কোনমতে ঠিকভাবে কাটিয়ে তোলার জন্য শ্রমিকদের মনোভাব ও তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আগ্রহ দেখে বাগিচা মালিকরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন শ্রমিক পিছু ২ আনা আট মাসের জন্য অন্তবর্তী কালীন বৃদ্ধি করতে রাজি হয়ে গেল। অবশ্য মূল দাবিগুলি—১ টাকা ১২ আনা দৈনিক মজুরী, বাড়তি পাতা তোলার বাড়তি পয়সা, বোনাস, স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধন প্রভৃতি দাবিগুলি অমীমাংসিত রয়েই গেল। ফলে শ্রমিকরাও মূল দাবিগুলি আদায়ের জন্য তাদের প্রচার চালিয়ে যেতে লাগল।

মালিকদের আক্রমণ

ঐক্যবদ্ধ দাবি ও আন্দোলনের মুখে যে চা-বাগান মালিকরা পাতা তোলার মরশুমটি নির্বিবাদে কাটিয়ে দেবার জন্য বাধ্য হয়ে দু-আনা দৈনিক মজুরী বাড়াল, তারাই ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ যখন পাতির মরশুম একেবারে শেষ হয়ে গেল তখন শ্রমিকদের উপরে অস্বাভাবিক রকমের কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মজুরী বৃদ্ধি পরোক্ষ-ভাবে কমিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কাজের বোঝা এমনভাবে বাড়ান হোল যে বেশির ভাগ শ্রমিকের পক্ষেই তাদের দৈনিক পুরো মজুরী রোজগার করা অসম্ভব হয়ে উঠল। কয়েকটি বাগানে এমনও হোল যে একদিনের কাজ পুরো করতে দুদিন লেগে যেতে লাগল অর্থাৎ শ্রমিকদের বাধ্য করা হতে থাকল দু-দিন কাজ করে একদিনের মজুরী পেতে। এই কাজের বোঝা বাড়ানোর সংগে সংগে অন্যান্য আক্রমণ, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পুরানো স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সাহায্যে ছাঁটাই ইত্যাদি বাগিচা মালিকরা ক্রমবর্ধমানভাবে করতে থাকে। পুলিশ ও সরকার মালিকদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। বহু শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১০৭ ধারা প্রয়োগ করে তথাকথিত বিচার করা শুরু হোল। কিন্তু সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও উৎসাহ দান সত্ত্বেও চা-বাগান মালিকদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার দিকে এগিয়ে গেল।

শ্রমিকদের মধ্যে এই ঐক্য এক নতুন সংগ্রামী চেতনা এনে দিয়ে-ছিল। সাধারণতঃ অতীতে পাতি ওঠার সময় শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতো, আর পাতি ওঠা শেষ হয়ে গেলেই মালিকরা শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করতো। পাতা উঠে যাবার পর এই আক্রমণের মুখে শ্রমিকরা নিঃসহায় বোধ করতো। এই জিনিষ

আমরা দেখেছি ১৯৫১-'৫২ সালের শীতকালে অর্থাৎ '৫১ সালের ডিসেম্বর এবং আরো তীব্রভাবে '৫২ ডিসেম্বর ও '৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে, যখন চা-বাগানের মালিকরা তথাকথিত চা-শিল্পের সংকটের নামে চা বাগান শ্রমিকদের কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত বেতন কেটে, সপ্তাহে মাত্র চার-পাঁচদিন কাজ দিয়ে, রেশনের দাম বাড়িয়ে শ্রমিকদের উপর এক অভাবনীয় আক্রমণ সংগঠিত-করেছিল; কংগ্রেস সরকারও যথারীতি মালিকদের সর্বপ্রকার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। সেই সময়ও শ্রমিকরা বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন বাগানে প্রতিরোধ করার নিষ্ফল চেষ্টা করেছিল। সেই সময় শ্রমিকদের সংগঠন ছিল দুর্বল এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্যই মালিকদের এই আক্রমণের সর্বাপেক্ষা বড় সহায়ক ছিল।

এবার কিন্তু অবস্থার এক আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠার ফলে এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তারা এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে।

সরকারের সাহায্যে ও উৎসাহে বাগিচা মলিকদের এই আক্রমণ সত্ত্বেও বাগিচা শ্রমিকরা বর্ধিত কাজের বোঝার বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং তাদের মূলদাবি আরো বেতন বৃদ্ধি, বোনাস, স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধন প্রভৃতি দাবিগুলি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। এটা ঘটছিল ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস ধরে। আন্দোলনও এমন পর্যায়ে গেল যে, ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই বাগিচা মালিকরা ডুয়ার্সে ১ টাকা ১১ আনা ৬ পাই এবং তরাই-এ ১ টাকা ১১ আনা এবং বাড়তি পাতা তোলার জন্য সের প্রতি তিন পয়সা মজুরী দিতে স্বীকৃত হোল। এটা অবশ্যই শ্রমিকদের আংশিক জয়লাভ হয়েছিল। মনে রাখা দরকার পি-এস-পি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি ছিল দৈনিক মজুরী ১ টাকা ১২ আনা; সেখানে ১ টাকা সাড়ে ১১ আনা ৬ পাই মালিকদের

কাছ থেকে আদায় করা মজুরীর দাবির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিরাট জয়। আর এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র যখন এ আই টি ইউ সি ইউনিয়ন এই একই দাবিতে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে শুরু করল।

আগস্ট মাসে একই দাবি দুই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পেশ করার পর এবং উভয় ইউনিয়নই এই দাবির সমর্থনে ধর্মঘটের নোটিশ দেবার পরই মালিকরা দু-আনা মজুরী বৃদ্ধি করে, এটাও চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ভাবে মজুরী বৃদ্ধির কথা শ্রমিকরা আগে কল্পনাও করতে পারত না। এর পরে অবশ্য শ্রমিকদের উপর মালিকরা প্রচণ্ড আক্রমণ সংগঠিত করেছিল, কিন্তু তাতে তারা শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি। মনোবল ভাঙ্গতে না পারার ফলে মালিকরা শেষ পর্যন্ত দৈনিক মজুরী আরো বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধনের দাবি, বাগিচা শ্রম আইন চালু করার দাবি, সর্বোপরি বোনাসের দাবি তখনও পূরণ হয় নি। ছয় মাসের মধ্যে দু'বার বেতন বৃদ্ধির পর শ্রমিকরা বোনাস এবং অন্য দুটি দাবি নিয়ে আন্দোলনে কতদূর পর্যন্ত যাবে সে বিষয়ে নেতৃত্বের মধ্যে কিছু কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেখা গেল বোনাসের দাবি নিয়ে শ্রমিকরা নিজেরাই বাগানে বাগানে সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগল। যৌথ সভা ও মিছিল মারফৎ ডুয়ার্সের সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ ধর্মঘটের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি চলতে থাকে।

শ্রমিকদের প্রতিরোধ

ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে, কাজের বোঝা বাড়ানোর বিরুদ্ধে এবং চার মাসের বোনাসের দাবিতে তীব্র হয়ে ওঠে এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রমিকদের টেনে আনতে থাকে। বাগিচা মালিকরা অবশ্য আক্রমণ চালিয়েই যেতে থাকল এবং সবচেয়ে সংগঠিত বাগানগুলিতে পুরো আন্দোলন শুরু

হবার আগেই দীর্ঘ ধর্মঘটে শ্রমিকদের ঠেলে দেবার জন্য সমস্ত রকম প্ররোচনা দিতে লাগল।

ডানকান ব্রাদার্সের লক্ষ্মীপাড়া বাগানের সমস্ত ইউনিয়ন নেতাদের দফায় দফায় ছাঁটাই করা হোল। শেষে যখন আধ ঘণ্টা দেরীতে কাজে আসার অজুহাতে পাঁচজন মেয়ে শ্রমিককে ছাঁটাই করা হোল, তখন শ্রমিকদের পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হোল না। শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রতিবাদ করল এবং তাদের কাজ দাবি করল। যখন বাগানের ম্যানেজার তাদের কাজ দিতে অস্বীকার করল, তখন সমস্ত শ্রমিক সেই পাঁচজন নারী শ্রমিককে সামনে রেখে বাগিচা ম্যানেজারের কাছে দাবি করল তাদের পাতা আগে ওজন করতে হবে। ম্যানেজার রাজী না হওয়ায় সমস্ত শ্রমিক তাদের পাতা মেঝেয় ঢেলে দিয়ে চলে যায়! এভাবে আড়াই মাস চলার পর শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দিল। তা আরো একমাস চলার পর শেষে বিষয়টি ট্রাইবুনালে পাঠানো হোল।

আরেকটি বাগান কাটালগুড়ি টি এস্টেটের শ্রমিকরাও ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে এই একই পথ নিয়েছিল অর্থাৎ আগে ছাঁটাই শ্রমিকরা কাজে যাবে এবং তাদের পাতা আগে ওজন হবে, পরে অন্যদের। এখানেও কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত প্ররোচনা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ছাঁটাই, শ্রমিকদের উপর একের পর এক মামলা এনে শ্রমিকদের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। এখানের শ্রমিকরাও তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম লক্ষ্মীপাড়ার শ্রমিকদের মতই এই আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল।

আরেকটি বাগান, গিলাণ্ডার্স আরবুথনটের ভগৎপুর টি এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রমিকদের অকাল ধর্মঘটে ঠেলে দেবার জন্য পর পর প্ররোচনা দিয়ে চলেছিল। শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য বাগানের ভিতরেই একটি লাইসেন্সবিহীন মদের দোকান চালু করল। সমস্ত রকম চেষ্টা তারা করল কিন্তু শ্রমিকরা শান্তভাবে এবং সফলভাবে কর্তৃপক্ষের এই সব নোংরা অপকৌশলের মোকাবিলা করল।

শেষ পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে পুলিশ এবার ময়দানে নামল আর এক-দিনেই বাগানের নিরানব্বই জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করল। তার মধ্যে পনেরো জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই বা সাসপেণ্ড করল একচল্লিশ জনকে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা মালিক ও পুলিশের সমস্ত জঘন্য প্ররোচনা অগ্রাহ্য করে অপেক্ষা করে রইল বোনাস, ছাঁটাই বিরোধী ইত্যাদি দাবিতে ডুয়ার্সের সমস্ত শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলনের জন্য। তাদের আশা বৃথা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ডুয়ার্স ও তরাই-এর শ্রমিকরা তাদের নিজ নিজ ইউনিয়নের ডাকে সাধারণ ধর্মঘটে বিপুলভাবে যোগ দিল।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দার্জিলিং জেলা চিয়াকামান মজদুর ইউনিয়নের তরাই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে যুক্ত তরাই-এর শ্রমিকদের কোন সংগঠন ছিল না। অবশ্য আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে সম্পর্কিত ও স্থানীয় কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত অপর একটি ইউনিযন ঐ বছরের গোড়ার দিকে তৈরী হয়েছিল। সাধারণ ধর্মঘটের সময মাত্র অল্প কয়েকটি বাগানেই চা শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত ছিল। এখানকার বাগিচা মালিকরা ডুয়ার্সের বাগিচা মালিকদের মত একই রাস্তা নিয়েছিল। কাজের বোঝা বাড়ান, ছাঁটাই, বাগান থেকে বের করে দেবার চেষ্টা প্রভৃতি মালিকরা একতরফাভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে নবগঠিত ইউনিয়নের শ্রমিকদের চেতনা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাই এমনকি তরাই-এর শ্রমিকরা, যারা ট্রেড ইউনিয়নে এই প্রথমবার সংগঠিত হোল, তারাও দ্রুত বুঝতে পারল মালিকদের অক্রমণ প্রতিরোধ করতে ও তাদের দাবি আদায় করতে হলে দরকার আরো ব্যাপক ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন। তাই অপেক্ষা করে ছিল যতক্ষণ না তাদের ডুয়ার্সের সাথীরা ১৯৫৫ সালের ২৯শে আগষ্ট থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল।

আর এস পি পরিচালিত ইউ টি ইউ সি'র অন্তর্ভুক্ত ডুয়ার্স চা

বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, এইচ এম এস এবং এ আই টি ইউ সি'র অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট শুরু হবার পনের দিন পূর্বেই ধর্মঘট শুরু করে। এইচ এম এস পরিচালিত ওয়েস্ট বেঙ্গল চা শ্রমিক ইউনিয়ন ১৬ আগষ্ট থেকে ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়। এ আই টি ইউ সি এবং ইউ টি ইউ সি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই তারিখে তারাও ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, কিন্তু এইচ এম এস'র নেতৃত্ব, এ আই টি ইউ সি'র সঙ্গে একই সঙ্গে ধর্মঘট করতে রাজী ছিলনা। তাই তারা তাদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। ইউ টি ইউ সি'র পক্ষ থেকে ননী ভট্টাচার্য্য জলপাইগুড়ি শহরে এসে এ আই টি ইউ সি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে ননী ভট্টাচার্য্য ছাড়াও গোপাল মৈত্র এবং সুরেশ তালুকদার। অন্যদিকে এ আই টি ইউ সি'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সুবোধ সেন, দেবপ্রসাদ ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, গোবিন্দ কুণ্ডু প্রমুখ। জলপাইগুলি শহরে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে বসে আলোচনা হয়। এ আই টি ইউ সি-এর নেতৃবৃন্দ এইচ এম এস-এর ধর্মঘটের তারিখ প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে এ আই টি ইউ সি-র এবং ইউ টি ইউ সি-রও তারিখ পরিবর্তন করার মত প্রকাশ করেন, কিন্তু ইউ টি ইউ সি নেতৃবৃন্দ ঐ তারিখ পরিবর্তন করা অসম্ভব বলে ঐদিনই ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত জানান। এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে এইচ এম এস কে বাদ দিয়ে সেই সময় এককভাবে ধর্মঘট করা অসুবিধা ছিল। তাহলে ঐ এলাকায় অর্থাৎ পূর্ব ডুয়ার্সে বাগানে বাগানে ধর্মঘট সফল হোত না এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হোত; তাতে মালিকদেরই সুবিধা হোত। তাছাড়া বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নে এ আই টি ইউ সি ইউনিয়ন নিজেদের প্রচারিত দাবি কমিয়ে দিয়ে এইচ এম এস-এর শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নে যে উন্নতমানের চেতনার পরিচয় দিয়েছিল এবং ঐক্যের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, আলাদাভাবে ধর্মঘট

করতে গেলে সেই ঐক্যের বাতাবরণ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেত।

কাজেই, ইউ টি ইউ সি ইউনিয়নের সঙ্গে এ আই টি ইউ সি একমত হতে পারেনি। যতদিন পর্যন্ত এইচ এম এস-এর ইউনিয়ন পুনরায় ধর্মঘটের আহ্বান না জানাবে ততদিন পর্যন্ত এককভাবে ধর্মঘট না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল।

সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করার পূর্বে মালবাজারে রাস্তার ধারে ফাগু ওরাঁও-এর বাড়ির সামনে ত্রিপল খাটিয়ে ইউনিয়নের সংগে যুক্ত সমস্ত বাগানের প্রতিনিধিদের নিয়ে সারা রাত ধরে মিটিং করা হোল। বিভিন্ন বাগানের প্রতিনিধিরা ধর্মঘটের তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য তাদের নিজ নিজ বাগানে প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা বললেন। সমস্ত রাত ধরে মিটিং হবার পর ঐক্যমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোল, এইচ এম এস পুনরায় ধর্মঘটের তারিখ ঘোষণা না করা পর্যন্ত এ আই টি ইউ সি অপেক্ষা করবে। সেই সংগে এটাও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে পরদিন থেকে প্রতিটি বাগানে এইচ এম এস-এর শ্রমিক এবং নেতাদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে অবিলম্বে ধর্মঘটের তারিখ ঘোষণা করার জন্য আবেদন জানাতে হবে এবং এইচ এম এস'র নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা অবিলম্বে ধর্মঘটের তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

পরদিন থেকেই প্রচার আন্দোলন শুরু হবার ফলে এইচ এম এস'র নেতৃবৃন্দ একটু অসুবিধায় পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত এইচ এম এস'র ইউনিয়নের কর্মীদের চাপে পড়েই, ওয়েস্ট বেঙ্গল চা-শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যকরী কমিটির সভা ডাকতে বাধ্য হয়। সেই সভায় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ধর্মঘট না করার যুক্তি কার্যকরী কমিটির সভ্যরা মানতে রাজী হলেন না। কার্যকরী কমিটিতে শেষ পর্যন্ত ২৯শে আগস্ট ধর্মঘট শুরু হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার সংগে সংগেই এ আই টি ইউ সি'র ইউনিয়নও ঘোষণা করে যে তারাও ঐ দিন থেকেই ধর্মঘট শুরু করবে।

ফলে বাগানে বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং বাগানে বাগানে লাল ঝাণ্ডা এবং সোস্যালিস্ট পার্টির ঝাণ্ডা এক সংগে শ্রমিকরা মিছিলে মিটিং-এ বহন করে নিয়ে যেতে শুরু করে। তার ফলে অসংগঠিত বাগানে শ্রমিকদের মধ্যেও নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

তরাই-এর স্থানীয় কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয় চা মজুর কংগ্রেস এবং এ আই টি ইউ সি র নবগঠিত ইউনিয়ন তরাই চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন ঐ একই দিনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৯৫৫ সালের ২৯শে আগস্ট ডুয়ার্স এবং তরাই-এর প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট সুরু হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৬ই আগস্ট থেকে ডুয়ার্সের তাল-চিনি এলাকার পূর্বাঞ্চলের বাগানগুলিতে ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘট যেহেতু সমগ্র ডুয়ার্সে হয়নি, তার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস সরকার প্রচণ্ড দমনপীড়ন শুরু করে। দলে দলে শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে রাখে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর লাঠি এবং গুলি চালান হয়, ফলে বহু শ্রমিক আহত হন। এই দমনপীড়ন চালাবার উদ্দেশ্য ছিল আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নের শ্রমিকদের কাজে যেতে সাহায্য করা। কারণ ঐ এলাকায় আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নও একটা শক্তি ছিল। এই ধর্মঘট পরিচালনার সময় চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ননী ভট্টাচার্য্য এবং ইউ টি ইউ সি-র তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক যতীন চক্রবর্তী সহ সমস্ত নেতাকেই গ্রেপ্তার করে আলিপুর মহকুমা জেলে রাখা হয়।

ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘট এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের মনোবলের প্রভাব সরকার ও মালিকদের উপরেও পড়েছিল। ১৯৫৪-৫৫ আর্থিক বছরে চা বাবদ

বিদেশী মুদ্রা আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৪৭ কোটি টাকা। কাজেই ধর্মঘটের সময় ছিল তেজী বাজারের সময় এবং ধর্মঘটের প্রতিটি দিনই ছিল মালিকদের পক্ষে খুবই মূল্যবান। সুতরাং মালিকরা ও সরকার উভয়েই দ্রুত মীমাংসায় আগ্রহী ছিল। ধর্মঘট চলাকালীন ৩১শে আগস্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্ল্যানটেশন লেবার স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভায় সরকার ও মালিকপক্ষ নিম্নলিখিত দাবিগুলি মেনে নিতে রাজী হোল ঃ—

(১) প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্টের অবিলম্বে প্রয়োগ;

(২) পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের প্রতি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অ্যাক্টের সুবিধার বিস্তৃতি;

(৩) রাজ্য সরকার অবিলম্বে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার সংশোধনের কাজ শুরু করবে;

(৪) বোনাসের প্রশ্নটি একটি বোনাস কমিটির কাছে পাঠানো হবে। তাতে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধি থাকবে ও একজন সরকারী উপদেষ্টা থাকবেন। এই কমিটিকে অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। যদি কমিটিতে কোন ঐক্যমত না হয় তবে সরকার বিষয়টি বিচারের জন্য আদালতে পাঠাবে কিনা ঠিক করবে।

এইভাবেই বিপুল শক্তিশালী মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে চা শ্রমিকরা জয়লাভ করল। ৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের তরাই শাখা ও কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত তরাই ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। ১০ তারিখে ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতারা মুক্তি পেলে তাঁরাও ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

দার্জিলিং শ্রমিকদের অবদান

দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রমিকরা ঐক্যের পথ দেখিয়েছিল, বস্তুতঃপক্ষে তারা তাদের ডুয়ার্সের সাথীদের জন্যও লড়াই করেছিল। তাদের এর জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি মেনে নিতে অংশতঃ হলেও সরকার ও মালিকপক্ষকে বাধ্য করার জন্য সাতটি জীবন বলিদান দিতে হয়েছিল। ছয়জন গুলিতে নিহত হন এবং একটি শিশু, জেলের ভিতর বন্দী মায়ের কোলেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। তাদের এই আত্মত্যাগই পথ দেখিয়েছিল ডুয়ার্স ও তরাই-এর শ্রমিকদের যৌথ দাবি—বোনাস, স্টাণ্ডিং অর্ডার ইত্যাদি প্রশ্নে মীমাংসার।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সারবস্তু

দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাই-এর চা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটির উপর বড় আঘাত। এটা লক্ষ্যনীয় যে শতকরা হিসাবে ভারতীয় বাগানের চেয়ে ব্রিটিশ বাগানই এই ধর্মঘটে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুটি কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে ব্রিটিশ মালিকানাধীন বাগানগুলির প্রায় শতকরা নব্বইজন শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীদের সমর্থনে জলপাইগুড়ি শহরে একদিনের হরতালে জীবনযাত্রা, স্থানীয় কংগ্রেসের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তার অন্যতম প্রধান কারণই ছিল এই আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সারবস্তু। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জলপাইগুড়ি শহর নিয়ন্ত্রিত হতো চা বাগিচা মালিকদের দ্বারা, যারা আবার স্থানীয় কংগ্রেস নেতা এবং হরতাল হয়েছিল তাদের সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও।

বার অ্যাসোসিয়েশন ও ব্যবসায়ী সংমেত সহরের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন হরতালে পাওয়া গিয়েছিল এ জন্যই যে ধর্মঘট মূলতঃ ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিকেই আঘাত করেছিল এবং জনসাধারণ এই ধর্মঘটকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসাবেই মনে করেছিল। শিলিগুড়িতে সকল স্তরের মানুষ ধর্মঘটের সমর্থনে একটি যৌথ আবেদন প্রকাশ করেছিলেন। জলপাইগুড়ির কংগেস নেতারা যেমন ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিল, তার বিপরীতে স্থানীয় কংগ্রেস খোলাখুলি এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছিল এবং তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়ন এ আই টি ইউ সি ইউনিয়নের সংগে যৌথভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। শিলিগুড়ি শহরেও একদিনের সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল এবং তাকে স্থানীয় কংগ্রেস সমর্থন করেছিল। ৭ই সেপ্টেম্বর ধর্মঘট তুলে না নেওয়া পর্যন্ত দুটি ইউনিয়ন যৌথভাবে সভা, মিছিল, প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল।

নিচুস্তরের উদ্যোগ

ধর্মঘট চলাকালীন সাধারণ শ্রমিকরাই বিভিন্ন ইউনিয়নের সদস্য শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য আনতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিল। এটা বিশেষ করে হয়েছিল ডুয়ার্সে, যেখানে ধর্মঘট পরিচালনার জন্য কোন যৌথ কমিটি গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। যৌথ সভা ও মিছিল সংগঠিত করার উদ্যোগ বিভিন্ন বাগানের নেতারাই নিয়েছিলেন। তাতে নিচু স্তরের ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

ডুয়ার্সে এ আই টি ইউ সি ইউনিয়ন ও পি এস পি-র দ্বারা পরিচালিত আই এন টি ইউ সি ইউনিয়ন উভয় ইউনিয়নের পতাকা নিয়েই বিভিন্ন জায়গায় যৌথ মিছিল ও সভা সংগঠিত হয়েছিল। একটি ব্রিটিশ মালিকানাধীন বাগানের ম্যানেজার পি এস পি-র পতাকা সরিয়ে দিয়েছিল, এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সি ভুক্ত ইউনিয়নের শ্রমিকরা তখনই নিজের নিজের পতাকা

নিয়ে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে তাকে বাধ্য করে, পি এস পি-র পতাকা একই জায়গার রাখতে। যৌথ কাজ, যৌথ সভা-সমাবেশ, নিচুস্তরের কর্মীদের উদ্যোগে হওয়ার ফলে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল।

ধর্মঘটের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, দু-একটি বাগান বাদে ডুয়ার্স বা তরাই-এর কোন জায়গাতেই পিকেটিং করার প্রয়োজন হয়নি। ২৯শে আগস্ট ভগতপুর টি এস্টেটে কয়েকজন শ্রমিক কাজে যোগদান করেছিল। পরদিন সকালেও পিকেটিং করা হয় নি, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের বুঝিয়েছিল দালাল হিসাবে কাজ করে তারা নিজেদেরই কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে। ফলতঃ পরদিন সকাল থেকে একজন শ্রমিকও কাজে যায়নি। ঐ ভগতপুর থেকেই পরদিন এক বিশাল শোভাযাত্রা নাগরাকাটা, হিলা প্রভৃতি বাগানের ভিতর দিয়ে গিয়ে পাঁচ মাইল দূরে একটি স্কুলের মাঠে জমায়েত হয়। নাগরাকাটা এলাকার বিভিন্ন বাগান থেকে হাজার হাজার শ্রমিক শোভাযাত্রা করে সমাবেশে মিলিত হয়। শোভাযাত্রাটি ছিল ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। লাল ঝাণ্ডা এবং তেরঙ্গা ঝাণ্ডা একই সাথে উড়তে থাকে, এছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় পতাকা নিয়ে শ্রমিকরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন বি পি টি ইউ সি-এর অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন রায়, জিলা চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক দেবপ্রসাদ ঘোষ, ভগতপুরের শ্রমিক নেতা মংলু ভগত, পুনাই ওঁরাও, মালবাজারের চা বাগান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাতা শ্রমিক জগন্নাথ ওঁরাও, পি এস পি পরিচালিত ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান নেতা প্রয়াত ঘনশ্যাম মিশ্র প্রমুখ। এই যুক্ত সমাবেশ এবং মিছিল সমগ্র নাগরাকাটা অঞ্চলে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে বানারহাট এলাকায় এ আই টি ইউ সি ইউনিয়নের পক্ষে কমরেড পরিমল মিত্র ছিলেন ধর্মঘট পরিচালনার দায়িত্বে। দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং মনোরঞ্জন রায় সাইকেলে করে সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চলের বাগানে বাগানে সভা-শোভাযাত্রা

পরিচালনা করেন। ঠিক একই সময় কমরেড পরিমল মিত্র বানার-হাট অঞ্চলের বাগানে বাগানে পায়ে হেঁটে মিছিল-মিটিং করে বেড়িয়ে-ছিলেন। উল্লেখ্য তিনি সাইকেল চালাতে জানতেন না। জলপাই-গুড়ির শহর এলাকার বাগানগুলির ধর্মঘট পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন এ আই টি ইউ সি-র সুবোধ সেন, সুধাময় দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যরা। ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে মনোরঞ্জন রায় ও দেবপ্রসাদ ঘোষ বানারহাট বাজারে গিয়ে উপস্থিত হন। পরিমল মিত্র সেখানে তাদের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। এলাকার শ্রমিক নেতারাও এদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। সেদিনই তাঁরা মোগলকাটা, কলাবাড়ী প্রভৃতি বাগানগুলিতে সভা শোভাযাত্রা করে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন।

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ও শ্রমিকদের চেতনা

এভাবেই পশ্চাদ্‌পদ শ্রমিকরা এতবড় ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট দশদিনব্যাপী চালিয়ে গেল। একমাত্র কালচিনি এলাকা ছাড়া, যার সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে, প্রায় আড়াইশো মাইল লম্বা এলাকায় সমগ্র ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের আর কোথাও শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালাবার কোন সুযোগই পুলিশ এবং আমলারা পায়নি। এর ফলে আর একবার প্রমাণিত হল যে ধর্মঘট চালাবার জন্য শ্রমিকরা কোন বলপ্রয়োগ করে না বা শ্রমিকদের বলপ্রয়োগ করতে হয়না। দমনপীড়ন ও বল প্রয়োগ করে ধর্মঘটকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা মালিক ও সরকারেরই একচেটিয়া ব্যবস্থা। কয়েকটি বাগানের ম্যানেজারদের সমস্ত রকম প্ররোচনা সত্ত্বেও দুই লক্ষ শ্রমিকের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটই প্রমাণ করে যে শ্রমিকদের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ভেঙ্গে পড়ার ছিলনা। একের পর এক বাগানে দেখা গেছে বড় বড় পোষ্টার "ধর্মঘটের সময় মদ্যপান নিষিদ্ধ"। এটা শ্রমিকরা স্বতঃ-স্ফূর্তভাবেই করেছিল, এরজন্য ইউনিয়নের কোন নির্দেশের প্রয়োজন

হয় নি। একটা ধর্মঘটের সময় যে শ্রমিকদের চেতনার মান কতটা বেড়ে যায়, পশ্চাদ্‌পদ চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট চলাকালীন এই পোষ্টার-গুলিই তার জ্বলন্ত নিদর্শন। এটা বুর্জোয়াদের অপপ্রচারেরও একটি উপযুক্ত জবাব ছিল। বেতন বৃদ্ধি না করার অন্যতম কারণ হিসাবে মালিকরা বলতো, "চা-শ্রমিকদের বেতন যতই বাড়ানো হোক না কেন, তারা নেশা করেই সেটা উড়িয়ে দেবে।" অথচ ধর্মঘট চলাকালীন তারা কেউই একদিনের জন্যও নেশা করল না—এটাই প্রমাণিত করে যে শ্রমিকরা ধর্মঘটকে কত গুরুত্ব দিয়েছিল। এর থেকে আরও প্রমাণিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চতর চেতনা এবং ধর্মঘট চালাবার জন্য প্রচণ্ড দৃঢ়তা।

কৃষকদের সাহায্য

এই ধর্মঘটের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল কৃষকদের, বিশেষ করে তরাই অঞ্চলের কৃষকদের, এই সংগ্রামের উদ্যোগ ও সক্রিয় সাহায্য দান। চা-এলাকার কাছাকাছির কৃষকরা চা-শ্রমিকদের মতই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত; উভয়েরই উৎস একই এবং তারা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে ১৯৭৬ সালে বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের সময় ডুয়ার্স এলাকার কৃষক ভাইদের সংগ্রামে সাহায্য করতে গিয়ে পাঁচজন চা-শ্রমিক পুলিশের গুলিতে জীবন দিয়েছিলেন। তরাই-এর চা-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ করার কৃতিত্ব পাশা-পাশি এলাকার কৃষকদের। এই কৃষকরাই তরাই অঞ্চলে ১৯৫৩-৫৪ সালে চা-শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংগঠিত করার প্রথম উদ্যোগ নিয়ে-ছিলেন। ধর্মঘটের সময়ও কৃষক স্বেচ্ছাসেবকরা তরাই অঞ্চলের দূর দূর বস্তিগুলিতে গিয়ে কৃষকদের বুঝিয়েছেন যে তারা যেন ধর্মঘট ভাঙ্গার দালালের ভূমিকায় না নামেন। এভাবেই সংগঠিত কৃষকরা বস্তিবাসী কৃষকদের, যারা পাতি তোলার মরশুমে নিয়মিতভাবে বাগানে কাজ করতেন, তাদের যাতে মালিকরা ধর্মঘট ভাঙ্গার দালাল হিসাবে ব্যবহার করতে না পারেন তার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বস্তি থেকে আনিত

কৃষকদের দিয়ে কাজ করাবার মালিকদের এই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। ফলে মালিকরা কোন অজুহাতই পেল না যাতে দালালদের দিয়ে কাজ করবার কথা বলে পুলিশ দিয়ে দমন-পীড়ন চালানো যায়। চ-বাগান মালিকদের শ্রমিক ঐক্যে ভাঙ্গণ আনতে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নিচুতলার শ্রমিকরা যে উদ্যোগ নিয়ে ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন, চা-বাগান অঞ্চলের এই ঐক্য আজও অটুট আছে। পরবর্তীকালে দার্জিলিং-ডুয়ার্স এবং তরাই-এর সমস্ত ইউনিয়নগুলি মিলিতভাবে চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পরবর্তীকালে আরো বহু ছোট-বড় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। চা-শ্রমিকরা একের পর এক সংগ্রামে জয়লাভ করেছে। শুধু বোনাসের দাবিই নয় চা-শ্রমিকরা আরো বহু সুযোগ সুবিধা মালিকদের অনিচ্ছুক হাত থেকে আদায় করতে সমর্থ হয়েছে।

ডুয়ার্সের পূর্বেকার পি এস পি এবং কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্য ছিল সাবষ্টাফ অর্থাৎ বৈদার, সর্দার, দফাদার দ্বারা পলিচালিত ইউনিয়ন গঠন করা। তারাই ছিল তাদের ইউনিয়নগুলির ভিত্তি। এ আই টি ইউ সি পরিচালিত ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্য ছিল এটি একেবারে নিচুতলার শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত ও সংগঠিত। ফলে এ আই টি ইউ সি দ্বারা পরিচালিত ইউনিয়নের ভিত্তি অন্যদের দ্বারা পরি-চালিত ইউনিয়গুলির চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ও দৃঢ় ছিল। ঐ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল এ আই টি ইউ সি ইউনিয়ন, যারা ঐক্যের জন্য সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তারা সমগ্র ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে বেরিয়ে এলো।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের চা শ্রমিকদের ঐ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছিল শ্রমিক আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। বহু আঁকাবাঁকা পথে এবং দৃঢ় প্রচেষ্টার ফলে এই ঐক্য গড়ে উঠতে পেরেছিল। পরবর্তীকালের

শ্রমিক সংগ্রামগুলিতে চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা ও তার সাফল্য থেকে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা নিয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে ১৯৫৪ সালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐবছর সমগ্র ডুয়ার্সে এবং জলপাইগুড়ি-কুচবিহার জেলায় প্রচণ্ড বন্যার ফলে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই বন্যার কবল থেকে দার্জিলিং জেলাও বাদ যায় নি। সমস্ত পাহাড়ী নদীগুলি বন্যার সময় প্রচণ্ড বেগে পাহাড় থেকে নেমে আসে। ফলে বড় বড় গাছপালা, ঘরবাড়ী ও পাথর স্রোতে মুখে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ বন্যায় চা বাগানগুলিরও বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। ডুয়ার্সে, বিশেষ করে জলঢাকা নদীর স্রোত এক ভীষণ আকার ধারণ করে। জলঢাকার উপর দিয়ে যে রেললাইন ছিল, যেটা মাল এবং চালসার সঙ্গে নাগরাকাটা আসার যোগাযোগ রক্ষা করতো, সেই রেললাইনের নিচের বড় বড় স্তম্ভগুলিকে পাহাড়ী নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা বড় বড় গাছ ও পাথরগুলি ক্রমাগত ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে ফেলে, ফলে মাঝখানের স্তম্ভগুলি স্রোতের জলে ভেসে যায়। দুইদিকের স্তম্ভগুলি তখনও ছিল, ফলে রেল-লাইনটা ঝুলছিল। বন্যার প্রথম দিনই জলঢাকার ঐ ব্রীজের অবস্থা দেখবার জন্য একজন অফিসার একটি পাইলট ইঞ্জিন নিয়ে ঐ ব্রীজের উপর যাওয়া মাত্রই নিচের স্তম্ভগুলি ভেঙ্গে পড়ে এবং ইঞ্জিনটি জলের স্রোতে ভেসে যায়! কর্মচারিটি প্রাণে বেঁচে যায়, কিন্তু সেটা অনেক পরে জানা যায় এবং কিভাবে বেঁচে যায় সেটা ছিল আশ্চর্য্যজনক। এই অবস্থায় নাগরাকাটার সঙ্গে অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঐ বন্যার পর মনিকুন্তলা সেন এবং মনোরঞ্জন রায় বন্যাপীড়িত এলাকাগুলি সরেজমিনে দেখবার জন্য কলকাতা থেকে রওনা হন।

ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চল একে অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থাতেই মানিকুন্তলা সেন এবং মনোরঞ্জন রায় ওদলাবাড়ী গিয়ে পৌছান। সেখান থেকে মানিকুন্তলা সেন যান দোমোহনী, ময়নাগুড়ি প্রভৃতি বন্যাপীড়িত এলাকায়। মনোরঞ্জন রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঝুলন্ত রেল লাইনের উপর দিয়ে মালবাজার থেকে

হাঁটাপথে নাগরাকাটার ভগতপুর বাগানে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে তারা পৌঁছাবার পরই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা জানতে পারেন। নাগরাকাটা বাগানের নদীর অপরপারে টন্দু বামনডাঙ্গা বাগান দুটি অবস্থিত ছিল। বাগান দু'টি ছিল ইংরেজ মালিকাধীন। টন্দু বাগানের নিচে শ্রমিক বস্তিতে প্রায় একশ ঘর শ্রমিক বসবাস করতেন। বন্যার প্রথমদিন ঐ লাইনের সমস্ত শ্রমিক উপরের বাগানের ফ্যাক্টরীতে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু পরদিন দুপুরেই বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার ফ্যাক্টরী অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এই অজুহাতে সমস্ত শ্রমিককে নিচের বস্তিতে পাঠিয়ে দেয়। তাদের বলা হয়েছিল যে যদি আবার বন্যা আসে তাহলে উপর থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে আবার সকলকে উপরে নিয়ে আসা হবে। আর ঠিক সেই রাত্রেই প্রচণ্ড বেগে বন্যার স্রোত এসে ঐ একশ ঘর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে চলে গেল। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল টন্দুর কিছু শ্রমিক যারা বেঁচে ছিল এবং যাদের ঐ বাগানের ম্যানেজার হাতীর পিঠে চড়িয়ে অপরপারে জলঢাকা বাগানের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়। টন্দু বাগানের শতাধিক নারী-শিশু-শ্রমিকদের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে ঐ ইংরেজ ম্যানেজার এ বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। উল্লেখ্য ঘটনার তিনদিন পরও বাইরের জগতের কোন মানুষ জানতেও পারেনি যে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং মনোরঞ্জন রায় টন্দুর শ্রমিকদের থেকে ঘটনার বিবরণ লিখে নেন এবং তার কয়েকদিনের মধ্যেই মানিকুন্তলা সেন-সহ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে এক প্রেস কনফারেন্সে সমগ্র উত্তরবঙ্গে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষ করে টন্দু বাগানের ঘটনাকে উল্লেখ করে শতাধিক মৃত্যুর জন্য ইংরেজ ম্যানেজারকে দায়ী করেন। এই নিয়ে যখন সংসদে প্রচণ্ড হই-চই শুরু হয় তখন ভারত সরকার একটি তদন্ত কমিশন করতে বাধ্য হন।

১৯৫৫ সালে চা শ্রমিকদের ঐক্যের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস বিবৃত করেই শ্রমিক আন্দোলনের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের একটি অধ্যায় শেষ হল। পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর কৃষকের দাবি নিয়ে আন্দোলন এবং আরো ব্যাপক ঐক্য ও মরণজয়ী সংগ্রামের ইতিহাস বিবৃত করা হবে।